দিনকাল

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শংকর প্রকাশন ॥ কলিকাতা-৬

অমিতাভ চৌধুরী
অনুজপ্রতিমেষু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই :

আরো একজন

আনন্দরূপ

খনির নতুন মণি

পুরুষোত্তম

অপরিচিতের মুখ

বাসকশয়ন

রূপের হাটে বিকিকিনি

মেঘের মিনার

ছুটি প্রতীক্ষার কারণে

সিকেপিকেটিকে

ফয়সলা

পিন্‌ডিদার গপ্‌পো

দিনকাল

এ-রকম একটা ছবি কলকাতা শহরেও কমই দেখা যায়।

বর্ষায় কলকাতার অনেক বড় বড় রাস্তায় হাঁটু জল দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে, অনেক ট্যাক্সি আর প্রাইভেট গাড়ি বিকল হয়ে চাকা-ডোবা জলের মধ্যে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর মরুভূমিতে ওয়েসিসের নাগাল পাবার মতো দুরাশা নিয়ে এক-এক জায়গায় এক-একটা মানুষের পিণ্ড জোট বেঁধে আছে এমন ছবিও আকছার চোখে পড়ে। একটা বাস দেখলেই জট ছাড়িয়ে ছোটাছুটির হিড়িক পড়ে যায়। যে নামবে সে নামতে পারে না। যে উঠবে সে উঠতে পারে না। এই চেষ্টা করতে গিয়ে বেশির ভাগ লোকের আর একটু বেশি ভেজা সার।

এরই মধ্যে যে দৃশ্যটা নতুন ঠেকল রণিত দত্তর চোখে, এই জল-ছবি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে সে-ও জাদুঘরের চিত্রের মতো বস্তা-পচা পুরনো ব্যাপার। ট্রাম বাস গাড়ি ঘোড়া লরি টেম্পো রিকশ স্কুটার—সব-কিছু অনড়-করা লম্বা মিছিল। হামেশাই দেখতে হয়। হামেশাই গতির পাখা মুড়ে নিরাসক্ত তপস্বীর মতো বসে থাকতে হয়। তবু রণিত দত্তর চোখে আজকের এই ছবিটা অনেকটা নতুন। উত্তর আর মধ্য কলকাতার ঠিক মাঝামাঝি একটা রাস্তা জলে জলাকার। বিকল প্রাইভেট গাড়ি আর ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। পয়সার বিনিময়ে সেগুলো ঠেলে সচল করার মতো রাস্তায় মেহনতী ছেলের দঙ্গলও নিরুৎসাহ। ফুটপাথের শেডে, দোকানের চালা আর গাড়ি বারান্দার নিচে মহাবস্থানের মহড়া চলেছে। আর রাস্তার

জলে বিশাল লম্বা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে মস্ত মস্ত ট্রাক লরি উঁচু-উঁচু একতলা দোতলা বাসগুলোও। এগুলো ওই হাঁটু জলের পরোয়া করে না। জায়গা পেলেই চলতে পারে। কলকাতার কাঁধে (নাকি বুকে ?) গতির ডানা যারা জুড়ে দিতে চান, বড় রাস্তায় বর্ষার জল এখনো বড় বাস বা ট্রাকের এনজিন ডোবায় না এমন দাবী করে থাকেন। কিন্তু বেশি জলে সরকারী বাসগুলো বিকল হবার সামর্থ্য নিজেরাই রাখে। আর জল দেখলে তারা জ্বরেও পড়ে, আস্তানা থেকে বেরুতে চায় না।

কিন্তু এই বর্ষণের সাজগোজ চলছিল বহুক্ষণ ধরে। ছোট বড় হুমকিও দিচ্ছিল থেকে থেকে। বহ্বাড়ম্বরে লঘুক্রিয়া ধরে নিয়ে কলকাতার চলমান মিছিলে ছেদ পড়েনি। কিন্তু আকাশটা একেবারে বিশ্বাসঘাতকের মতো ভেঙে পড়ল। একঘণ্টার মধ্যে রাস্তা এক হাঁটু জলের নিচে। সেই জল ভেঙে সপসপ করে এগিয়ে আসছে এক বিরাট মিছিল। উত্তর থেকে তারা দক্ষিণে চলেছে। লক্ষ্য সম্ভবতঃ ময়দান। এই মিছিলেরও সাজসজ্জা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে। মাঝপথে আকাশ এমন বেইমানি করলে তারা কি করবে ? এত বড় একটা মিছিল ভেঙে দিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে পড়বে ? তাতে জলের হাত থেকে মাথা বাঁচবে না জিনিসপত্রের দাম নেমে আসবে ? তার থেকে এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে ফুঁসলে আর গজরালে সংকল্পের জোরটা আরো বরং মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। সকলে বুঝবে পশ্চিম বাংলা দুর্বল আপোস জানে না—ঝড় জল কেয়ার করে না। বিশেষ করে এটা যখন অনেকটা দলমত নির্বিশেষের মিছিল। বামপন্থী সরকারও স্পষ্ট আঙুল তুলে কেন্দ্রকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। বলেছে, সব-কিছুর আকাশ-ছোঁয়া দামের জন্য কেন্দ্র দায়ী। মাত্র ক'টা মাসের মধ্যে সব-কিছুর দাম বিশ থেকে পঁচিশ ভাগ উঁচিয়ে উঠল, কেন্দ্রের বে-হিসেবী বে-দরদী অপদার্থতার কারণে। এর বিরুদ্ধে

বাঁচার জেহাদে আবার দল মত কি ? তাই মিছিলের আঁকা-বাঁকা ত্ব'সারি বপুটিও সুদীর্ঘ।

হাঁটু জল। তার মধ্যে শম্বুকগতি চলমান মিছিল। তার ফলে সচল বাস, ডবল ডেকার, মিনি আর ছোট বড় গাড়িগুলোও অচল। এই চিত্রটাই রণিত দত্তর চোখে নতুন ঠেকছিল।

সাধারণত মিছিল কভার করার ভার তার ঘাড়ে পড়ে না। সে ভিতরে ভিতরে একটা সংস্কারের ঝাঁটা হাতে ঘুরে বেড়ায়। সুড়ঙ্গ পথের অনাচার ব্যভিচার চুরি জোচ্চুরি বাটপারি ঝেঁটিয়ে প্রকাশের আলোয় নিয়ে আসে। তারপর টকমিষ্টি রসের ভিয়েনে চড়িয়ে সে-সব গরম গরম পরিবেশন করে। এই গুণাবলীর জন্য 'সবুজ রঙের' কর্মকর্তাদের সে বেশ প্রিয়পাত্র। আজ হাতে কিছু কাজ ছিল না। আপিসেও লোক কম। তাকে মিছিলের দিকে যেতে বলা হয়েছে— সে-ও বেরিয়ে পড়েছে। ডেস্ক-এ বসে মাথা-গুঁজে কাজ তার ভালোও লাগে না।

লেন্স মুছে মুছে বেশ জুৎসই গোটা তিনেক ছবি নিল রণিত দত্ত। ভালো সাবজেক্ট পেলে সঞ্চয় রাখতে হয়। পরে বেশি দরে বিকোয়। হঠাৎ মাঝ-রাস্তায় জলের ওপর ঠুঁটো জগন্নাথের মতো দাঁড়ানো একটা দোতলা বাসের এক তলার জানলায় চোখ গেল তার। মুখ চেনা কিনা ঠাওর হলো না। কত জায়গায় ঘোরে, কত দেখে। চেনা-অচেনার ফারাক তার কাছে খুব বেশি নয়। কিন্তু চোখ টানল অন্য কারণে। মেয়েটা সুশ্রী বেশ (অমন বয়সের প্রায় সব মেয়েই রণিতের চোখে মোটামুটি সুশ্রী), কিন্তু তার মুখে রাজ্যের বিরক্তি বাসা নিয়েছে। কোমরের খানিকটা ওপর থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। তাতে বোঝা যাচ্ছে সর্বাঙ্গ ভেজা। পরনে মোটামুটি ভালো একটা সাদা জমিনের ওপর লালচে ডুরির শাড়ি, গায়ে তেমনি হালকা লাল ব্লাউজ। শাড়িটা বুক-কাঁধ বেড়িয়ে গলা পর্যন্ত জড়ানো। ঢাকাঢুকি দিয়ে বসে থাকার চেষ্টা, কিন্তু শাড়ি ব্লাউজ দস্তুরমতো

ভেজা বলে ঐশ্বর্য তেমন ঢাকা পড়ছে না। বিরক্তি-ছাওয়া চাউনি ওই মিছিলটার দিকে। ওটার যেন আদি অন্ত নেই। বছর বাইশ তেইশ হবে বয়েস। একখানা স্থির যৌবন ভিতরে ভিতরে তিক্ত বিরক্ত হয়ে উঠছে।

মেয়েটি চেনা কি অচেনা রণিত দত্ত তা নিয়ে আর এক মুহূর্ত মাথা ঘামালো না। সে সাবজেক্ট খোঁজে। সাবজেক্ট পেলে তার চোখে পর্দা থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আগের তিনটে ছবিই ম্যাড়মেড়ে। জল আর মিছিল আর অচল যানবাহনের সঙ্গে এই চিত্রটিও কাগজে বসিয়ে দিতে পারলে সোনায় সোহাগা। সুশ্রী মেয়েরা মাঙ্গল্যের প্রতীক। আগের দিনের রাজা মহারাজারা যুদ্ধে বেরুনোর সময়েও সুন্দরী মেয়েদের মুখ দেখে রওনা হতো।

ক্যামেরা রেডি করে চটপট বাসটার গায়ে চলে এলো। মেয়েটা তখনো তাকে দেখেনি।

—এ-দিকে শুনুন।

পাশ থেকে ডাক শুনে মেয়েটি চকিতে এ-দিকে ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর ফ্ল্যাশ বালব্ ঝলসে উঠল।

—থ্যাংক ইউ।

কেউ কিছু ভালো করে বোঝার আগেই রণিত দত্ত সপসপ জল ভেঙে বাসের পিছন দিক দিয়ে সরে গেল। যে দু'চারজন দেখেছে বা বুঝেছে, এই জলে ভিড় ঠেলে বাস থেকে নেমে বীরত্ব দেখাতে আসবে না। এলেও কাগজের কার্ড পকেটে আছে। আগের ছবিতে কত ছেলের মুখই তো উঠেছে—তেমন দুই একটা মেয়ের মুখ না থাকলে কাগজের ছবি জমে? এটা তার মতে নির্দোষ সাংবাদিকতা আর নির্দোষ লোকরঞ্জন।

কিন্তু এই শেষের ছবিটা দেখলে সবুজ-রঙ্গ সম্পাদক মহেন্দ্র চক্রবর্তী ঠিক আলাদা করে একটা কপি চাইবে। ইদানীং ব্যাটার মতি-গতি তেমন স্পষ্ট বুঝছে না রণিত দত্ত। পঞ্চাশের দিকে বয়েস

গড়াচ্ছে, সেই সঙ্গে রসও বাড়ছে কিনা কে জানে। বাইরে গম্ভীর, কিছু বোঝা যায় না। রণিত দত্ত এক সময় একে দেখেই তলোয়ারের থেকে কলম বড় ভাবত। সংস্কারের মোক্ষম ঝাঁ্যাটাটি এই ভদ্রলোকই তার হাতে তুলে দিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি সতীর্থদের এর সম্পর্কে চুটকি রসিকতা কানে আসছে। ঘরে ডেকে এর মধ্যে ওর কাছ থেকে তিন-তিনটে ছবিও চেয়ে নিয়েছে। নিজস্ব একটা ডকুমেণ্ট অ্যালবাম করছে নাকি। ছুটো ছুই অভিজাত মক্ষীরাণীর ছবি। তৃতীয়টি বিপাকে-পড়া এক তরুণী প্রোফেসারেব।

না, এ-ছবিটা আলাদা করে সম্পাদককে আর দেখাবে না। একবারে সুপারইমপোজ-টিমপোজ যা করার করিয়ে নিয়ে ছাপতে দেবে। তারপরে চাইলে মূল ছবিটা হারিয়ে যেতে কতক্ষণ? আর নেগেটিভও কি জলে-টলে নষ্ট হয়ে যায় না? খটকা যখন লেগেছে একটু, অমন জলে-ভেজা মেয়ের ছবি তার খপ্পরে গিয়ে না পড়াই ভালো। যদিও সতীর্থদের ঠাট্টা ঠিসারার মধ্যে সত্য কিছু আছে সে একবারও ভাবে না।

বাসের সেই মেয়ে দূর্বা বোস।

ছেলেটা এ ভাবে তাকে ডেকে নিয়ে ছবি তুলে চলে যাবার পর তার ভিতরের মেজাজের আঁচ কেউ অনুমান করতে পারবে না। চাল-জল চড়ালে সেই আঁচে ভাত হয়ে যেত। যে আশায় দক্ষিণ কলকাতা থেকে উত্তর কলকাতায় বাস ঠেঙিয়ে আসা—তাতে ছাই। খুব আশা করে এসেছিল বলে মন মেজাজও আগে থাকতে তেমনি খারাপ। তারপর এই বৃষ্টি। ছুটে বাস-স্টপের শেডে গিয়ে দাঁড়ানোর আগেই বিচ্ছিরিভাবে ভেজা হলো একপ্রস্থ। বহুক্ষণ বাদে শ্যামবাজার থেকেই মোটামুটি ভিড় নিয়ে এসেছে বাসটা। উঠতে গিয়ে আরো খানিকটা ভিজল। যে অবস্থা তাতে আর অপেক্ষা করার মানে হয় না।

বাসে আর একপ্রস্থ মেজাজ চড়েছিল। বাসে ভিড় থাকলেও এমন ভিড় নয় যে চাপাচাপি বাঁচিয়ে সামনের নিরাপদ দিকটায় আসা যায় না। কিন্তু সে চেষ্টা করতেই পিছনের দিকের কতগুলো চলতি মানুষ রড ধরে এদিক ওদিক ঘুরে বৃষ্টি দেখায় তন্ময় হয়ে পড়ল। আর্দ্র অঙ্গে চাপাচাপির ধকল সামলে তবু সামনে না এগিয়ে উপায় কি। আর কয়েকটা স্টপ পার হতে সামনের দিকেও চাপা-চাপি। অবশ্য তখন সত্যিই জমাট-বাঁধা ভিড়। তবু দূর্বার ধারণা লোকগুলো চেষ্টা করলে আর একটু সুস্থির আর সভ্যভব্য হতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোকও বাসে থাকে না এ-তো আর হতে পারে না। দূর্বার পাশেও আর একটি মেয়ে। সে আগে থাকতে স্টপে দাঁড়ানোর ফলে মাথা গা বাঁচাতে পেরেছিল। আর সামনেই এক-জোড়া তরুণ-তরুণী বসে। একটু বাদে ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে দূর্বাকে বসতে বলল। তারা সামনের স্টপে নেমে যাবে। দূর্বা হাঁপ ফেলে বাঁচল। স্টপ আসার আগেই বউটাও উঠল। ভিড় ঠেলে দরজায় যেতে হলে আগে থাকতে প্রস্তুত হওয়া দরকার। দূর্বা বোস জানলায় সরে গেল, পাশে অপর মেয়েটা বসল।

বসার পরেও অস্বস্তি। বিরক্তি। সেই ওঠার সময় থেকে এ-পর্যন্ত কত জোড়া পুরুষের চোখ যে ভিজে জামা কাপড় ফুঁড়ে সর্বাঙ্গে বিঁধে আছে ঠিক নেই। ফলে জানলা দিয়ে সে ঠায় বাইরের দিকে চেয়েই বসে আছে। তার মধ্যে এই মিছিল। মিছিলটা আর এক রাস্তা দিয়ে বেঁকে বড় রাস্তায় এসে পড়েছে। এর শুরু কোথায় বা শেষ কোথায় ঠাওর করতে না পেরে দূর্বা বোস প্রায় হাল ছেড়ে ওই মিছিলই দেখছিল আর জল দেখছিল। তার মধ্যে এমন বেপরোয়া ছবি তোলার কাণ্ড।

দূর্বার পাশে যারা দাঁড়িয়ে, বা ঠিক সামনে অথবা পিছনে যারা বসে তারা ব্যাপারখানা বুঝেছে। এ-রকম একটা অভিনব ব্যাপার ঘটে যেতে তারা বেশ মজাই পাচ্ছে। দূর্বা আবার সেই সামনের

দিকেই চেয়ে আছে আর রাগে ফুঁসছে। সুবিধে এই, খুব রাগ হলেও চট করে বাইরে থেকে সেটা বোঝা যায় না।

একটু বাদে ভুরু কুঁচকে মনে করতে চেষ্টা করছে কিছু। যে লোক এই কাণ্ড করে গেল তার মুখটা তারও চেনা-চেনা লাগছে। ক্যামেরা কাঁধে খবরের কাগজের লোক হতে পারে ভাবতেই মনে পড়ে গেল। আলাপ কখনো হয়নি, তবে চেনাই বটে। ফলে এবারের রাগ এক ঝটকায় মাথায় চড়ল।

॥ দুই ॥

দূর্বা বোসের একটি নির্ভেজাল প্রেমিক আছে। পাশের ছোট্ট দোতলা বাড়ির বাসিন্দা। বাড়িটা নিজস্ব। দোতলার সবটা তাঁর দখলে। একতলায় ছোট-খাট একটা টিউটোরিয়াল হোম। তার ভাড়া মন্দ নয়। প্রেমিকের নাম রাধাকান্ত আচার্য। বয়েস পঁচাত্তর। এখনো শক্ত পোক্ত, পাকানো চেহারা। রাত থাকতে উঠে লেকে বেড়াতে যান। বিকেলেও কম করে তিন মাইল হাঁটেন। ঠোঁটের ফাঁকে মজাদার দুনিয়া-দেখা হাসি লেগেই আছে। হাতের লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করলে ছেলে ছোকরার দল সরে পড়ে। এত বড় পাড়ার মধ্যে মানী মানুষ। আবার ভক্তি ভালবাসার মানুষও। আর সুরসিকও তেমনি। জিভের কোনো লাগাম নেই।

মস্ত নামী স্কুলের নামী মাস্টার ছিলেন। স্কুল মাস্টারি করে নিজের বাড়ি ঘর ক'জনের হয়? এঁর হয়েছে। হয়েছে নিজের লেখা খান কয়েক বইয়ের কল্যাণে। অঙ্কের বই আর স্কুল-পাঠ্য ফিজিক্সের বই। সমস্ত পশ্চিম বাংলার স্কুলের ছেলেমেয়েদের এই বইয়ের চাহিদা। যত দিন যাচ্ছে ততো কদর বাড়ছে।

নিজের কেরামতির গল্প নিজেই করেন ভদ্রলোক। তাঁর প্রথম বারের এম-এস্‌-সির সাবজেক্ট ছিল অঙ্ক। তখন আবার এম-এ এম-এস্‌সি-তে থার্ড ক্লাসও ছিল। ফল বেরুতে ফার্স্ট ক্লাস থেকেই নিজের নাম খুঁজতে শুরু করেছিলেন। নামতে নামতে দেখা গেল সেকেণ্ড ক্লাসের একেবারে শেষ নামটা তাঁর। আর একটু নামতে পারলেই থার্ড ক্লাস ফার্স্ট হতে পারতেন। গোঁ ধরে এরপর ফিজিক্স নিয়ে পরীক্ষা দিলেন। এবারে তাঁর নামটা সেকেণ্ড ক্লাসের মাঝামাঝি ঠাঁই পেল। ডবল এম-এস-সি হয়েও সরকারী কলেজে চাকরি জুটল না। অগত্যা সোজা রাস্তায় পা বাড়ালেন। সেই থেকে তিন যুগের ওপরে স্কুল মাস্টারের চেয়ারে জাঁকিয়ে বসেছিলেন। চব্বিশ বছর বয়সে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। পঁয়ষট্টিতে রিটায়ার করেছেন। স্বাস্থ্য দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষ তখনো ধরে রাখার জন্য ঝুলোঝুলি। তিনি স্বেচ্ছায় চলে এসেছেন।

যে-কথা নিজের মুখে খুব জাহির করেন না, সেটা তাঁর ছেলে পড়ানোর কেরামতি। গাধা পিটে সত্যি ঘোড়া হয় কিনা কে জানে। কিন্তু অনেক গাধা-মার্কা ছেলেকে যে তিনি ঘোড়া-মার্কা বানিয়েছেন এটা সত্যি কথা। পরের দিকের ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া মাষ্টাররাও তাঁর এই প্রতিভা অস্বীকার করতেন না। জটিল জিনিসের সহজ রাস্তা বার করার ব্যাপারে তাঁর জুড়ি নেই। এই মাস্টারির জীবনে একটাই নেশা ছিল তার, এবং এখনো কিছু কিছু আছে। জ্যোতিষী-চর্চা। এতে খুব যে একটা অন্ধ-বিশ্বাস আছে এমন নয়। নেশাটাই বড়। এতেও জটিল অঙ্ক কষার আনন্দ পান। আর বলেন, এই বিদ্যে ফলিয়ে অন্য লোককে ঘায়েল করার মতো মোক্ষম অস্ত্র আর নেই। স্কুলের হেডমাস্টার ছেড়ে কত বড় বড় গণ্যমান্য জনের কাছে এই বিদ্যের দরুন তাঁর খাতির কদর। এখনো এই গুণের ফলে পাড়ার প্রবীণরা তাঁকে সমীহ করেন, বিপাকে পড়লে ছুটে আসেন। রাধাকান্ত আচার্য অবশ্য জ্যোতিষীর থেকে সহজ যুক্তির রাস্তাই বেশি দেখিয়ে

দেন। আর ছেলে-ছোকরারা ভাগ্যফল জানতে এলে লাঠি নিয়ে তাড়া করেন।

এই জ্যোতিষী চর্চার যাচাই নিজের ওপর দিয়েই তিনি প্রথম করেছিলেন। ঠিকুজির মতে তার বেশ টাকা আর ভালো নামডাক হবার কথা। বাড়তি পয়সার টিউশনি ভালো লাগে না, লটারির টিকিটও কেনেন না। টাকা হবে কোত্থেকে? আর স্কুল মাস্টারের নামডাক হতে পারে এমন কোনো রাস্তা আছে নাকি?

অবশ্য ছাত্র মহলে ততদিনে তাঁর দারুন নামডাক। ততদিনে স্কুলে চৌদ্দ বছরের বনবাস কাল পার। অঙ্ক বা ফিজিক্স-এর দুরূহ জিনিসকে সহজ মেড্-ইজি করার চিন্তা সর্বদাই মাথায় ঘুরপাক খায়। ভেবেচিন্তে স্কুলের নিচের দিকের চার-পাঁচ ক্লাস জুড়ে অঙ্কের বই লিখলেন একটা। এক বন্ধুর সঙ্গে শেয়ারে সেই বই ছাপা হতেই দিন ফেরার সূচনা দেখা গেল। পরের দু'বছরে উঁচু ক্লাস ক'টার জন্য অ্যারিথমেটিক অ্যালজাব্রা আর জিওমেট্রির এক্সট্রা চ্যাপ্টারগুলো ধরে মোটা বই লিখে ফেললেন একটা। অনেক ঝুঁকি নিয়ে, বউয়ের গয়না পর্যন্ত বেচে একলার দায়িত্বে সেই বইও ছেপে ফেললেন। তারপর থেকে অভাব কাকে বলে জানেন না।

উঁচু ক্লাসে ফিজিক্স পাঠ্য হবার পর থেকে বই লেখা আর উপার্জনের রাস্তা আরো প্রশস্ত হয়েছে। টানা একচল্লিশ বছরের শিক্ষক জীবনে এক-এক যুগে এক-এক রকমের ছাত্রধারা দেখেছেন। তাঁর অনেক কৃতী ছাত্রও এখন অবসর জীবনে পা ফেলেছে। আর বহু ছাত্র এখনো বড় চাকরি বা বড় রকমের মর্যাদার আসনে বসে আছে। কেউ ডাক্তার, কেউ এনজিনিয়ার, কেউ শিক্ষাবিদ। ক্বচিৎ কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তারা এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নেয়। ছাত্র বলে পরিচয় দেয়। রাধাকান্ত আচার্যর কারো মুখ ধু-ধু মনে পড়ে, কারো বা পড়ে না। বিশেষ করে কারো কথা অত মনে করে বসে থাকেন না তিনি। যুগে যুগে ছাত্রধারার যে পরিবর্তন লক্ষ্য

করেছেন সেটুকুই কৌতূহলের ব্যাপার। এই পরিবর্তনের মূলে বেশির ভাগ আধুনিক ছাত্রের আধুনিক গার্জেনরা। এ-সম্বন্ধে চেষ্টা করলে সম্ভবত একখানা মজার বই লিখে উঠতে পারেন রাধাকান্ত।

ছেলে নেই। তিনটিই মেয়ে। এক একটি মেয়ে এসেছে আর ভদ্রলোকের আয়পয় বেড়েছে। স্ত্রীব এ-কারণে গর্ব ছিল খুব। কথায় কথায় বলতেনও সে-কথা। স্ত্রীর হিসেবে যে বেশ ভুল হচ্ছে জেনেও ভদ্রলোক প্রতিবাদ করতেন না। চাকরিতে ঢুকেছিলেন চব্বিশ বছর বয়সে, বিয়ে করেছিলেন উনত্রিশ বছর বয়সে আর বই লেখা শুরু করে-ছিলেন আটত্রিশ বছর বয়সে। বড় দুই মেয়ে তার অনেক আগেই পৃথিবীর মুখ দেখেছে। বাড়তি রোজগারের তাগিদে তখন টিউশনি করতে হত, জুটতও সহজে। বড় মেয়ে আসার পর আই-এস-সি ছাত্র পড়ানোর টিউশনি পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় মেয়ে আসার পর টিউশনির সংখ্যা আর একটা বাড়াতে হয়েছিল। এও আয়পয়ের লক্ষণ হলে তর্ক তুলে লাভ কি। সময় ধরে হিসেব না করলে ভাগ্যের মুখ যে মেয়েরা আসার পরে দেখেছেন তাতে তো ভুল নেই। মেয়েদের আয়পয় না বলে স্ত্রী যদি বলতেন তাঁর নিজের আয়পয়ে তাতেও আপত্তি করার কিছু ছিল না।

সাত বছর হলো স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। তার ফলে ভদ্রলোক কতটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন সেটা শোকের মুখেও তেমন বোঝা যায়নি। নিজে বরং ভেঙে পড়া মেয়েদের সান্ত্বনা দিয়েছেন। তার ঢের আগে অর্থাৎ সময়কালে তিন মেয়েরই একে একে বিয়ে হয়ে গেছে। সকলেই ভালো ঘরে-বরে পড়েছে। আটটি নাতি নাতনির মুখ দেখে মনে কোনো খেদ না রেখেই গৃহিণী চোখ বুজেছেন। মেয়েরা এখন তাদের সংসারের গিন্নি-বান্নি হয়ে বসেছে। এসে থাকতে কেউ পারে না। ফাঁক পেলে বাপকে এসে দেখে যায়। পুরনো দিনের রান্নার বামুনটা আছে। দোকান-পাটে ছোটাছুটির যেটুকু কাজ, সেই করে। এ ছাড়া গিন্নির আমলের পুরনো ঝি-টাও আছে। রাধাকান্ত

· আচার্যর বোধহয় অসুবিধে বোধটাই কম। তাই দিব্বি চলে যাচ্ছে।

এ-হেন আচার্য মশায়ের প্রেমিকার আসনটি পাশের বাড়ির এক তলার দূর্বা সেন যে জুড়ে বসে আছে তার পিছনে ছোট্ট একটা ঘটনা আছে। তাঁর বড় মেয়ে অমিতাব প্রথম সন্তানটি ছিল মেয়ে। এক বছর বয়সে ফুড পয়েজনিং-এ মা যা যায়। কি মুখে দেওয়া বা খাওয়ার ফলে সেই শোকাবহ ঘটনা আজও কেউ জানে না। বড় মেয়েও তাব অনেক আগেব থেকেই খুব অসুস্থ। ছ'মাস বাবা-মায়ের কাছে এসে ছিল। পাশের বাড়িব এই দূর্বারও তখন বছরটাক বয়েস। ফুটফুটে বাচ্চা। ঝিয়ের কোলে চেপে হামেশা এ-বাড়িতে আসত। অমিতার মেয়ের সঙ্গে খেলা কবত। মেয়েটা চলে যাবাব পরেও ঝিয়ের কোলে চেপে এসে চাবদিকে তাকাতো, একজনকে খুঁজত—হুঁ-হাঁ করে জিজ্ঞাসা কবত তাব সাথীটি গেল কোথায়।

সেই থেকে বড় মেয়ে আর সেই সঙ্গে গিন্নিরও এই বাচ্চা মেয়েটার ওপর খুব টান। যখন তখন তাকে এ-বাড়ি নিয়ে আসা হতো। গিন্নি অনেক সময় তাকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন পর্যন্ত। আর বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাও সর্বদা এ-বাড়ি আসাব জন্য ব্যস্ত। এই টান বজায় থাকার আরো কাবণ, পরের দু'বছরের মধ্যেও অমিতার আর ছেলেপুলে হয়নি। তার পরেও মেয়ে আর হয়-ই নি। পর পর চারটেই ছেলে। ফলে তার কাছে দূর্বার আজও মেয়ের আদর, আর রাধাকান্ত আচার্যর কাছে বড় নাতনির আদর। কিন্তু ওদের ঘরের অনেক সমস্যা আব অনেক অশান্তি বলেই আদবটা সর্বদা খোলাখুলি দেখানো সম্ভব হতো না। কিন্তু ভিতরের টান থেকেই গেছে। ও-দিকে অমিতা সংসারেব জালে বেশি জড়িয়ে পড়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাব বাপের বাড়ি আসা কমেছে। সেই ফাঁকটুকু ভরাট করেছেন দাদু অর্থাৎ রাধাকান্ত আচার্য। আর সাত বছর আগে গিন্নি চোখ বোজার ক'দিনের

মধ্যেই দাতুর ঠাট্টা, তোর আর সতীন বলে কেউ থাকল না রে, এখন শুধু তুই আর আমি।

দূর্বার তখন ষোলো বছর বয়েস, স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে। এ-সব রসের কথা তার না বোঝার কথা নয়। তার তখন মন মেজাজ ভীষণ খারাপ। এ-বাড়ি ভিন্ন একটু আদর যত্ন কোথাও জোটে না। এ-বাড়ির দিতুটিও ওকে কম ভালো বাসত না। যখন তখন ডাকত, এটা সেটা খেতে দিত, সমবয়সীর মতো কত রকমের কথাবার্তা হতো তু'জনের। সেই দিতু নেই। তার মধ্যে দাতুর অমন ঠাট্টা। রাগ চাপতে না পেরে দূর্বা বেশ করে জিভ ভেঙচে ছুটে পালিয়েছিল। পরের এই ছ'সাত বছরে ওদের ছোট্ট পরিবার ভেঙে তচনছ হয়ে গেছে। শান্তি বলে কিছু নেই। এ অবস্থায় পাশের বাড়ির এই দাতুটি না থাকলে দূর্বা হয় পাগল হয়ে যেত নয়তো গোঁ ধরে আরো তুর্বিপাকের মধ্যে তলিয়ে যেত। দাতু তখন তাকে চুম্বকের মতো টেনে রেখেছে। এখনো রাখছে। অন্য দিকে রাধাকান্ত আচার্য জানেন নিজের আপদে বিপদে মেয়ে জামাইরা আছে, ফোনে একটা খবর পেলেই সব ছুটে আসবে। তবু মনে মনে অনুভব করেন সব থেকে কাছে আছে পাশের বাড়ির একতলার তু'ঘরের ফ্ল্যাটের ওই পাতানো নাতনিটি।

বৃষ্টির দাপটে আজ বিকেলে বেরুতে পারেন নি। এদিকের রাস্তায়ও বেশ জল জমেছিল। এখন অবশ্য বৃষ্টি নেই, জলও সরে গেছে। কিন্তু আকাশ এখনো কালি হয়েই আছে। যে-কোনো সময়ে আবার ভেঙে পড়লেই হয়। অল্প স্বল্প বৃষ্টি হলে তিনি ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু এ তুর্যোগে বেরুনোর চিন্তা বাতিল। তাই রাস্তার দিকের সরু বারান্দার এ-মাথা ও-মাথা হেঁটে বিকেলের বেড়ানো সারছিলেন। আর মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে নিচের রাস্তার লোক চলাচল দেখছিলেন।

একটু বাদে বেড়ানো সাঙ্গ করেই দাঁড়িয়ে গেলেন। দূর্বা আসছে।

দূর্বা রূপসী নয় এমন কিছু। গায়ের রং মোটামুটি ফর্সা। স্বাস্থ্য ভালো। চাউনি মিষ্টি। সাজসজ্জায় সাদাসিধের ওপর পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ আছে। রাধাকান্ত আচার্য অত খুঁটিয়ে দেখেন না অবশ্য। তাঁর মনে হলো মেয়েটা পথ আলো করে আসছে। সর্বদাই এমনি সুন্দর দেখেন তিনি ওকে। ওর দৃষ্টি কাড়ার অপেক্ষায় চেয়ে আছেন। হাসছেন অল্প অল্প।

দূর্বাও দূর থেকেই দেখেছে দাদুকে। কিন্তু বুঝতে দেবার ইচ্ছে নেই। গায়ের জামা-কাপড় দুই-ই সপসপে না হোক, ভেজা এখনো। চোখোচোখি হলে এমন কিছু রসের কথা চেঁচিয়ে বলে উঠতে পারে যে কান গরম হবে আর ওকে পালিয়ে বাঁচতে হবে। চোখোচোখি না হলেও ছাড়বে মনে হয় না। এমন হাড়ে-হাড়ে বজ্জাত বুড়ো দূর্বা কম দেখেছে। আগে তার ঘরে ঢুকে জামা-কাপড়গুলো বদলানোর তাড়া। তাছাড়া রসিকতা শোনার মেজাজ নয় একটুও। অন্য সময় হলে আর লোকের চোখে না পড়লে দূর্বা বুড়োকে জিভ ভেঙচায় এখনো।

বাধা পড়ল।—বর্ষা বাদলায় শ্রীমতীর চলার ঠমক দেখে তো বাঁচি না, ও-কি ও-দিকে পা বাড়াচ্ছিস কেন—আগের দরজা দিয়েই ঢুকে পড়—তোর দিদুর কিছু জামা-কাপড় এখনো আলমারিতে আছে বোধহয়, বার করে দিচ্ছি।

রাস্তার লোক ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে, বুড়োর ভ্রূক্ষেপও নেই। একবারও না তাকিয়ে দূর্বা আরো তাড়াতাড়ি নিজেদের দরজা ঠেলে ভেতরে চলে গেল। রাধাকান্ত আচার্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলেন।

মিনিট কুড়ি বাদে জামা-কাপড় বদলে আবার ওকে দরজার বাইরে আসতে দেখেই রাধাকান্ত তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে এসে বসলেন। গম্ভীর। তিন-বার পড়া খবরের কাগজে মন।

একটু বাদে দূর্বা দোতলায় উঠে এলো। ঘরে ঢুকল। কাছে

এলো। দাদুর গম্ভীর মুখে কাগজ পড়া দেখল। তারপর তার হাতের এক ঝাপটায় কাগজটা দাদুর হাত থেকে খসে মেঝেতে গিয়ে পড়ল। দাদু তবু গম্ভীর। বলল, বেইমানি করে যে আমাকে কলা দেখায় তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

গম্ভীর দূর্বাও।—বেইমানী করে কি কলা দেখালাম?

দাদু চোখ পাকালো।—তোকে যতটা ভেজা দেখলাম, জামা-কাপড় তার থেকে ঢের বেশি ভিজেছিল কিনা?

—ভিজেছিল।

—ডবকা জিনিস-পত্র তখন আরো বেশি দেখা যাচ্ছিল কিনা?

অনায়াসে যে ধরনের কথাবার্তা হয় দু'জনের বাইরের কেউ হঠাৎ শুনলে কানে আঙুল দেবে। দূর্বা জবাব দিল, যাচ্ছিল বোধহয়।

হিংসেয় মুখ কালো করার চেষ্টা দাদুর।—বাসের আর রাস্তার লোকেরা সব তখন ড্যাবড্যাব করে দেখছিল কিনা?

—দেখছিল বোধহয়।

—গেট্ আউট! আমার ঘর থেকে বেরো এক্ষুনি! রাস্তার লোককে মজা লুটতে দিয়ে আমার বেলায় যত আপত্তি! জামা-কাপড় বদলে পটের বিবি সেজে আসা হলো?

দূর্বা তার পাশেই বসে পড়ল। বলল, ঠিক আছে, নাগালের মধ্যেই বসলাম, যেমন ইচ্ছে তেমনি দেখো।

দাদুর মুখে হাসির ফাটল ধরল।—যা, এবারের মতো ক্ষমা করে দিলাম, সর্বদা এ-রকম উদার হবি। চট করে উঠে বারান্দার তারে ঝোলানো শুকনো তোয়ালেটা নিয়ে এলেন। তারপরে নিজেই ওর মাথাটা ভালো করে মুছে দিতে লাগলেন। একটু বাদে দূর্বা তার হাত থেকে তোয়ালেটা ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিল।

দাদু বললেন, আমার কাছে ব্রায়োনিয়া আছে, এক ডোজ্ খেয়ে নিবি?

—খিদেয় পেট চোঁ-চা করছে, আর তুমি এক ডোজ্ ব্রায়োনিয়া খাওয়াচ্ছ।

দাদু বলল, তাহলে কি দিই তোকে এখন, হারু ব্যাটাব তো এখনো দেখা নেই। ঘরে ডিম আর পাঁউরুটি আছে, আলু-পটোলও আছে—কিছু কবে নিবি?

—শেফালি কি কবছে দেখে এলাম, ব্যস্ত হ'য়ো না। তোমার চা-টা খাওয়া হয়েছে?

—বিকেলে তো আর টা কিছু খাই না—চা চারটের মধ্যেই করে খেয়ে নিই। তোকে কবে দেব একটু?

—না, তোমাব জন্যেই জিগ্যেস করছিলাম। যাকৃগে, শোনো, যে-জন্যে গেছলাম কিছু হলো না।

রাধাকান্ত ভবসা কবে এটুকুই জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারছিলেন না। ভাবছিলেন মেয়েটা কাজের কথা কিছু বলে না কেন। শোনামাত্র বিমর্ষ।—হলো না! যার নামে চিঠি দিয়েছিলাম তার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—হয়েছে। তাকেই চিঠি দিয়েছিলাম। মণ্টেসেরি পাশ না শুনে দু'কথায় বিদেয় করে দিলেন। বললেন, গ্র্যাজুয়েট হলে হবে না, তাঁদের মণ্টেসেরি পাশ চাই।

শুনেই রাধাকান্তরও মেজাজ বিগড়লো।—গুষ্টির মাথা চাই! পড়বে সব অ-আ-ক-খ, তাও গ্র্যাজুয়েট দিয়ে হবে না—কালে কালে আরো কত যে দেখব!

দাদু যে তার মতোই হতাশ দূর্বা বুঝতে পারে। উত্তর কলকাতায় মেয়েদের নামী স্কুল আছে একটা। তাতে বাচ্চাদের একটা আলাদা ব্র্যাঞ্চ আছে। সে ব্র্যাঞ্চের টিচারদের বেশ ভালো-মাইনে। অনার্স গ্র্যাজুয়েট নয়, বি. টি. নয়—অমন নামী স্কুলে উঁচু ক্লাসের টিচারের চাকরি হবে না সেটা দূর্বা যেমন জানে, দাদুও তেমনি জানেন। নইলে ওই স্কুলের সর্বেসর্বা যে মহিলা সে তাঁর একজন কৃতী ছাত্রের স্ত্রী।

ছাত্রটির এখনো মাস্টারমশায়ের প্রতি খুব শ্রদ্ধা ভক্তি। প্রতি বছর ✓বিজয়ার পর আসে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে যায়। অনার্স বা বি.টি.-র ফ্যাকড়া না থাকলে ওই স্কুলেই দূর্বার একটা চাকরি অনায়াসে হয়ে যেতে পারত। এ সব কথা নিজেই তিনি একসময় ওকে বলেছিলেন।

সেই স্কুলে একেবারে বাচ্চাদের বিভাগে শিক্ষয়িত্রী নেওয়া হবে খবর পেয়ে দূর্বা দাছুর কাছে ছুটে এসেছিল। ইদানীং কালের স্কুল মাস্টারদের মাইনে-পত্তর কি রকম হয় দাছুর কোনো ধারণা ছিল না। বিশেষ করে হাল ফ্যাশনের মেয়েদের নামী স্কুলে। তাই বাচ্চাদের বিভাগ আছে জেনেও তিনি বড় একটা গা করেননি। রোজ শ্যামবাজারে যাতায়াতেই তো কত খরচ হয়ে যাবে। কিন্তু দূর্বার মুখে মাইনের অঙ্ক শুনে তাঁরও কিছু উৎসাহ হয়েছিল। তক্ষুনি ছাত্রকে টেলিফোনে অনুরোধ করেছিলেন কাজটা যেন দূর্বা বোনের হয়—মেয়েটা তাঁর নিজের নাতনির থেকেও বেশি।

ছাত্রও শোনামাত্র তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিল, স্ত্রীকে তিনি যা বলার বলে রাখবেন—মেয়েটিকে যেন একটা চিঠি দিয়ে স্কুলে তাঁর স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন।.রাধাকান্ত পরদিনই অর্থাৎ আজ সেই চিঠি দিয়ে দূর্বাকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এবারে তোর ঠিক হয়ে যাবে দেখিস—কাজটা হলে আমি তোর নরম গালের সঙ্গে নিজের এই বাঁধানো দাঁতের গালটা একবার ঘষে ছাড়ব বলে দিলাম।

চাকরির আশা এবারে ছিলই, তাই খুশি মুখে দূর্বাও জবাব দিয়েছিল, অত যখন সাধ, চাকরির জন্য অপেক্ষা করার দরকার কি, এখনই ঘষে নাও না।

এতখানির পরে এই সমাচার। বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে দাছু বললেন, লাভের মধ্যে তোর জলে ভেজা আর যাতায়াতের ধকল পোহানোই সার হলো।

ছেলেবেলা থেকেই হতাশার জীবন দূর্বার। তাই ভাবনা চিন্তা

ঝেড়ে ফেলতেও পারে। না পারলে রক্ষা ছিল না। দাদুকে নকল করে তেমনি একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে সে-ও হাল্‌কা মেজাজে ফিরতে চেষ্টা করল। বলল, লাভ একেবারে কারো হয়নি এমন নয়, একটা ছেলের অন্তত হয়েছে।

দাদু রসের সন্ধান পেল। চোখ বড় করে জিগ্যেস করল, কি রকম ?

বেশ গুছিয়ে রাস্তার জল, তার মধ্যে বিশাল মিছিলে বাস আটকে যাওয়া, ভিজে শাড়ি গলায় জড়িয়ে বসে থাকা আর শেষে এক বেপরোয়া ছেলেব ফোটো তুলে নেওয়াব ব্যাপারটা গপ্প করল দাদুর কাছে। শুনে দাদুর দু'চোখ কপালে—বলিস কি রে ! এ-যে একেবারে দিনে দুপুরে ডাকাতি—তোকে ডেকে মুখ ঘুরিয়ে ফোটো তুলে নিল ! তুই নেমে এসে দু'ঘা দিতে পারলি না ?

—কই আর পারলাম।

—কই আর পারলাম ? ওই ছেলে বিনা উদ্দেশ্যে অমন বেপরোয়ার মতো ফোটো তুলে নিয়ে গেল ভেবেছিস—ওটা ও রাতে বিছানায় নিয়ে যাবে না—প্রাণের সাধে চুমুটুমু খাবে না ? উঃ ! আমাব বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে একেবারে। তোর লজ্জা করল না বলতে ?

দূর্বা হাসছে।—আমার আবার লজ্জা কি, ফোটোতে কি আমাকে পাবে ? তারপর গম্ভীর একটু।—তোমাকে বললাম তার কারণ আছে। তুমি সেই ছেলেটাকে চেনো। তোমার এখানে তাকে আমি দুই একবার দেখেছি, মনে হয় সে-ও আমাকে দেখেছে। তাই আমি ভেবে পেলাম না এত সাহস হয় কি করে !

—আমি চিনি ! আমার এখানে দেখেছিস ? দাদু লাফিয়ে উঠল।—কে বল দিকি, তার মাথাটা আমি একেবারে ছিঁড়েই নিয়ে আসব।

—নাম জানি নাকি ! লম্বা কালো মতো ট্রাউজারের ওপর হাত-

গোটানো শার্ট, বড় চুল—কোনো কাগজের রিপোর্টার-টিপোর্টার হবে—এমন কাউকে জানা নেই তোমার ?

রাধাকান্ত আপন খেয়ালে থাকেন, কিন্তু স্মরণশক্তি এ-বয়সেও ভোঁতা হয়ে যায়নি। ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন। কাগজের রিপোর্টার শুনে একটা মুখ হাতড়ে বেড়ানো সহজ হলো। শরীর ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে বসলেন।—কে···রণিত দত্ত নয় তো ?

—রণিত দত্ত কে আমি জানি ?

—ওই যে কি-একটা থার্ড ক্লাস কাগজের সঙ্গে লেগে আছে, সবুজ রঙ্গ না কি নাম, যেমন বললি চেহারার সঙ্গে তো মেলে কিছুটা···সরকার বাড়ির ফরমাস নিয়ে আমার এখানে কয়েক বার এসেছেও। কিন্তু ওই ছেলে তো মস্ত সমাজবাদী হয়ে বসে আছে, পার্টি করে, কোথাও বেলেল্লাপনা বা দুর্নীতি দেখলে কাগজে লিখে হুল ফোটায়—তার এমন কাজ ? ফের দেখলে তুই চিনবি তো ?

দূর্বা নির্দ্বিধায় মাথা নাড়ল, চিনবে।

দাদু বলল, দাঁড়া, সরকার বাড়িতে টেলিফোন করে জেনে নিচ্ছি ওখানে থাকে কি না। থাকলে পাঠিয়ে দিতে বলব, তারপর তোকেও ডাকব।

দূর্বা হেসে জিজ্ঞাসা করল, সে-ই যদি হয় তো কি করবে ?

দাদু তেমনি চোখ পাকিয়ে জবাব দিল, অল্পেতে ছাড়ব ভেবেছিস, ওই ফোটোর একটা কপি আমাকে না দিলে খুন করে ফেলব না ?

দূর্বা হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল।—এরপর শেফালি আমাকে খুন করতে আসবে, খাবার তৈরি করে বসে আছে—

শেফালি ছোট বোন। বয়েস সতের। দূর্বার থেকে ছ' বছরের ছোট। কিন্তু বয়সের তুলনায় বেশি পেকে গেছে। কারো থেকে বেশি ছোট বা কম বুদ্ধিমতী ভাবে না নিজেকে। সিনেমার নাম শুনলে জিভে জল গড়ায়। একবার ফেল করে এবারে ক্লাস টেন-এ উঠেছে। পড়ার বইয়ের থেকে সিনেমার পত্র-পত্রিকাগুলোর প্রতি ঢের বেশি

মনোযোগ। পাড়ার ছেলেমেয়েগুলোর কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে নিয়ে আসে। দিদির সঙ্গে বনিবনা তেমন নেই, কারণ দিদি ফাঁক পেলেই তাকে বকা-ঝকা করে, উপদেশ দেয়। দিদিকে হিংসে করে তার প্রধান কারণ, তারও চেহারা পত্র খারাপ নয়, কিন্তু দিদির ঢের ভালো। মনে মনে দিদিকে বোকাও ভাবে আবার। বছরের পর বছর চলে যায়, দিদি চেহারা ধুয়ে কেবল জলই খাচ্ছে—তেমন কেউকেটা কারো কাঁধে চেপে বসতে পারছে না। দিদিটি বে-খাপ্পা রকমের বেগে না গেলে তাকে ও কেয়ারও করে না। বরং নিজেই বড়র মতো উপদেশ আর পরামর্শ দিতে আসে।

দূর্বা ঘরে ফেরার দশ মিনিটের মধ্যে আবার বৃষ্টি এলো। তোড়ে নয় অবশ্য। সন্ধ্যে হয় হয়। বেশ ঠাণ্ডা বাতাসও ছেড়েছে। চিঁড়ের সঙ্গে আলু কুচিয়ে দিয়ে তেলে ভেজে বেশ রসালো জলখাবার করেছে শেফালি। এ ব্যাপারে তার মাথা ভালো খোলে। ওতে একটু পেঁয়াজ-কুচি ভাজাও মিশিয়েছে। তাতে নুন গোল মরিচ। ছু'বোন নিঃশব্দেই খাচ্ছিল। শেফালি আশা করেছিল দিদির মুখে ছুটো প্রশংসার কথা শুনবে।

আলু-চিঁড়েভাজা চিবুতে চিবুতে টেরিয়ে টেরিয়ে দিদির মুখখানা দেখল বার কয়েক।—আজও তুই টিউশনিতে যাবি ?

—না যাবার কি হয়েছে ?

—এখনো তো বৃষ্টি পড়ছে, একবার ভিজে নেয়ে এলি, আবার ভিজতে হবে।

মুখ তুলে এবার বোনের মুখখানা লক্ষ্য করল দূর্বা। কোনো উদ্দেশ্য ভিন্ন ওর মুখে দরদের কথা বড় শোনা যায় না। একটা নয়, সকাল আর সন্ধ্যায় ছু'ছুটো টিউশনি করে নিজের আর বোনের অনেক খরচ চালাতে হয় তাকে। সন্ধ্যের টিউশনির কড়াকড়ি আরো বেশি। ক্লাস সেভেনের একটা মেয়ে পড়ে। মাস গেলে চল্লিশ টাকা মাইনে। গোটা মাসের কামাইয়ের হিসেব তারা রাখে। কামাই হলে মাইনে

কাটে না অবশ্য, কিন্তু মেয়ের মা মাইনে দিতে এসে কথা শোনায়। শেফালি বলে তুই একটা বোকা তাই চল্লিশ টাকায় আছিস, আমাদের ক্লাসের টিচাররা ক্লাস সেভেনের মেয়ে পড়াতে কমসে কম একশ' টাকা নেয়। বসন্তদাকে বলে মাইনেটা পঞ্চাশ ষাট টাকা করে নিলেও তো পারিস।

আজকালকার বাজার দর দূর্বাও মানে। কিন্তু সে দাম তাকে দিচ্ছে কে? উল্টে ওই চল্লিশ টাকার জন্যেই বিচ্ছু ছাত্রীটিকে তোয়াজ তোষামোদ করে চলতে হয়। সকালের টিউশনির মাইনে পঁচিশ টাকা। একটা বাচ্চা ছেলে পড়ে। সর্বসাকুল্যে পঁয়ষট্টি টাকা ঘরে আনে। কিন্তু এতে সুখ না থাকুক স্বস্তি আছে। এক মারোয়াড়ী বাড়ি একশ' টাকা মাইনের টিউশনি জুটেছিল। এগারো দিনের দিন পালিয়ে বেঁচেছিল। সেই এগারোটা দিনের মাইনেও আর আনতে যায়নি। এগারো দিনের মধ্যে চার দিন ছাত্রী আর তার মা বাড়ি ছিল না। ছাত্রীর বাপ ছিল। সে এসেছিল। পড়ানোর সময় পর্যন্ত ঘড়ি ধরে তাকে আটকে রেখেছিল। সেই ফাঁকে একদিন তাকে বড়লোক করে দেবার প্রস্তাব করেছিল।

আজ এ-ভাবে ভিজে-তিতে এমন হতাশা নিয়ে ঘরে ফেরার পর সন্ধ্যায় আবার ছাত্রী ঠ্যাঙাতে যাবার ইচ্ছে দূর্বারও ছিল না। কিন্তু শেফালির মাথায় কি আছে সেটা বোঝার জন্য সে-কথা বলল না। জিজ্ঞেস করল, ঘরে বসে থেকে কি করব, তোর কি ইচ্ছে—

—তোর বরের কাছ থেকে কয়েকটা টাকা চেয়ে নিয়ে আয় না, বৃষ্টি বাদলার রাত, একঘেয়ে ভাত ডাল তরকারি আর ভাল লাগে না। ঘরে ডাল তো আছেই, কিছু সুগন্ধি চাল, কয়েকটা ডিম আর আদা-পেঁয়াজ এনে খিচুড়ি রাঁধতে পারিস—গরম গরম খিচুড়ি আর ডিম ভাজা—আঃ!

ভাবতেও জিভে জল গড়ানোর দাখিল শেফালির। বরের কাছ থেকে টাকা চেয়ে আনার অর্থ ও-বাড়ির দাদুর কাছ থেকে। দরকারের

আঁচ পেলে চাইতে হয় না, দাছু নিজে থেকেই ওর হাতে টাকা গুঁজে দেয়। আঁচ পেতে আর অসুবিধে কি, বাবাকে তো হাড়ে হাড়ে চেনে। তাই প্রতি মাসের শেষের দিকে নিজেই খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে হাতে খরচ চালানোর মতো টাকা আছে কিনা। থাকুক না থাকুক দূর্বা অম্লানবদনে মাথা নাড়ে। অর্থাৎ, আছে। পারত হাত পেতে সে দাছুর কাছ থেকে টাকা নিতে চায় না। এই দাছুকে নিয়ে মনে মনে হিংসে শেফালির। অথচ দাছু যখন করে, ছ'জনার জন্যেই করে। পূজোতে ষষ্ঠীতে নিজের মেয়েদের আর নাতি নাতনিদের জন্য যেমন জামাকাপড় কেনে, ওদের ছ'বোনের জন্যও তেমনি কেনে। জন্মদিনে শেফালি সবার আগে দাছুকে প্রণাম করতে ছোটে। সবার আগে কেন, আর কাউকে তো করেই না। শুধু এই এক জায়গায় প্রণাম করলে নগদ লাভ। দিদিটা বোকা, তার জন্মদিন কবে জিগ্যেস করলে বলে দেয়, জানে না। না জানলেও বছরের যে কোনো একটা দিন ঠিক করে নিলেই তো হয়। কিন্তু তবু শেফালি মনে মনে বেশ জানে দাছুর প্রাণবল্লভা যদি কেউ থেকে থাকে সে এই দিদিটি। তাই 'তোর বর' ছাড়া আর কিছু বলে না। শুনে শুনে দূর্বারও সয়ে গেছে।

মাসের এটা মাঝামাঝি। সংসারের টাকা ছাড়াও নিজের টাকা কিছু হাতে আছে এখনো। হিসেবের বাইরে দূর্বা একটি টাকাও বাড়তি খরচ করে না। আজ বোনের এই খাওয়ার লোভটাকে সে দরদের চোখেই দেখল। ওর সবই স্বাভাবিক। খেতে ভালো লাগে, পরতে ভালো লাগে, ফূর্তি ভালো লাগে, সিনেমা থিয়েটার ভালো লাগে।

দূর্বা বলল, চাইতে হবে না, টাকা আমি দিতে পারি, কিন্তু তোকে রাঁধতে হবে, আমি পারব না।

শেফালি তখুনি ফোঁস করে উঠল।—তা পারবি কেন, কেউ রেঁধে এনে দিলে মহারানীর মতো বসে খেতে পারবি। আচ্ছা টাকা দে, আমিই করছি সব।

ব্যাগ খুলে দূর্বা পাঁচ টাকার একটা নোট বার করে ওর হাতে

দিল। মুহূর্তের মধ্যে কিছু ভেবে বলল, এক কাজ কর, দাত্নর ছাতাটা চেয়ে নিয়ে যা, আর হারুকে বলে দিবি, ভাত-টাত যেন না রান্না করে—এখান থেকে খিচুড়ি আর ডিমভাজা যাবে।

একটু ইতস্তত করে শেফালি বলল, তাহলে তো পাঁচ টাকার সবটাই লেগে যাবে—

—লাগে লাগবে, তা বলে আমরা খাব আর দাত্ন খাবে না?

এখানে সময় সময় একটু ভালো মন্দ যা-কিছু রান্না হয়, দাত্নর জন্যে একটু ভাগ যায় জেনেও শেফালি ঠাট্টা ঠিসারা করতে ছাড়ে না। হি-হি করে হেসে উঠল।—আগের দিনে তো ঘাটের মড়াও নাবালিকা ঘরে আনত রে দিদি—বাবাকে বলে লাগিয়ে দিই না?

দাবড়ানি খাবার আগেই ছুটল। সোজা দোতলায় দাত্নর ঘরে।—হারুকে বলে দাও আজ তোমার নো ডাল ভাত রান্না—তোমার প্রাণেশ্বরী খিচুড়ি আর ডিম ভাজা পাঠাচ্ছে, ছাতাটা দাও—জলদি!

দিতে হলো না, ঘরের কোণ থেকে নিজেই তুলে নিল।

রাধাকান্ত হেসে জিজ্ঞেস করলেন, উৎসব কেন, তোর কিছু গতি টতি হলো?

শেফালি মুখ মচকে জবাব দিল, আমার আর কি গতি হবে, বর্ষার দিনে তোমার জন্যে দিদির মন উড়ু-উড়ু, সেই মওকায় তার ঘাড় ভেঙে পাঁচটা টাকা আদায় করলাম—নইলে দিদির হাত দিয়ে পয়সা গলে?

ছুটল। পিছন থেকে রাধাকান্ত বললেন, হারুকে একবার ডেকে দিয়ে যা—।

বাজার আর দোকানপাট ঘর থেকে দু'মিনিটের পথ। কেনা-কাটা শেষ করে দাত্নর ছাতা দাত্নকে ফিরিয়ে দিয়ে এসে শেফালি বাইরে তোড়জোড়ে বসল। রান্না-বান্না বেশির ভাগ দু'জনকে কিছুটা ভাগাভাগি করে করতে হয়। সকালে দিদির টিউশনি। ফলে আপিসের আগে বাবাকে ভাত দেবার দায় শেফালির। এ নিয়ে

দিদিকে কম কথা শোনায় না। যদিও খুব সকালে উঠে রান্নার কাজ কিছুটা সেরে রেখেই বেরোয়। রাতের রান্না দিদির বরাদ্দ। আটটার মধ্যে টিউশনি সেরে এসে রান্না চড়ায়। যে-দিন পারবে না ওকে আগে থাকতে বলে যায়। এ বিদ্যেয় শেফালিরও মোটামুটি পাকা হাত এখন।

গম্ভীর মুখে তোড়জোড়ে বসে শেফালি দিদিকে বলল, যা আজ তোর ছুটি, আমি সব ক'চ্ছি। তোর বর হুকুম করেছে, হারু এসে তোর আর তার খাবারটা একসঙ্গে নিয়ে যাবে, মুখোমুখি বসে খাবে। এমন দিনে তোকে বলার মতো তার কিছু কথা আছে।

মন মেজাজ এখনো ভালো না দূর্বার। তবু হাসি চাপতে হলো। মেয়েটা দিনকে দিন বড় বেশি পাকা হয়ে যাচ্ছে ভেবে চিন্তাও হয়।

মিনিট পনেরর মধ্যে কড়া নাড়ার শব্দ। নিজের বিছানায় দূর্বা গা ছেড়ে শুয়েছিল। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকালো। কিন্তু শব্দটা তেমন চেনা-হাতের কড়া নাড়ার মতো মনে হলো না। উঠে এলো। কিন্তু তার আগে কে এলো দেখার জন্যে শেফালিও উঠে এসেছে। তারও অসহিষ্ণু চাউনি। দরজাটা সেই খুলল।

পরের মুহূর্তে দুই চক্ষু বিস্ফারিত। আনন্দে মুখে কথা সরে না।

হারু। তার হাতে ঝোলানো রূপোর চাঙের মতো নধর-বপু একটা গঙ্গার ইলিশ। দেখার মতোই, কম করে দেড় কিলো হবে। হারু জানালো, কর্তা বলেছেন, ডিম-ভাজা আর খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজাও খাবেন।

বিহ্বল আনন্দের ধাক্কায় শেফালি একটা কাণ্ডই করে ফেলল। হঠাৎ দিদির গলা জড়িয়ে ধরে দু'গালে চক্-চক্ করে দুটো চুমু খেয়ে বসল। হারু মাছ রেখে চলে যেতে রাগের সুরে দূর্বা বলল, কি করিস, আমি সামনে না থাকলে ওই চুমু দুটো ওর বরাতেই জুটত?

শেফালি হি-হি করে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে চলে গেল।

দূর্বা একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল। ও-রকম ইলিশ মাছ ওরা বাজারেই যা দুই একটা দেখে। ঘরে আনার কথা ভাবেও না। কিন্তু অদৃষ্ট তো এ-রকম হবার কথা নয়।

এবারে তাকেও এসে হাত লাগাতে হলো। শেফালির এখন চার গুণ উৎসাহ।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই এত উৎসাহে ছাই পড়ল এক-দফা। ওদিকের দরজায় আবার ধাক্কা। এই ধাক্কা দু'বোনেরই খুব চেনা। বাবা এলো। দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকালো। এ-সময়ে এই একজনের আসাটা উপদ্রবের মতো। নেশা সেরে রাত দশটা সাড়ে দশটার আগে সচরাচর ঘরে ফেরে না। দাদুর কারসাজিতে দাপটের বাবা বছর দেড় দুই যাবৎ অনেক টিট হয়েছে। চুক্তি-মতো বাইরে থেকে নেশা সেরে আসতে হয়। তার আগে সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ ছ'দিন বাড়িতেই হুলস্থূলু কাণ্ড হতো। তবু বাড়িতেও যে এক-একদিন নেশা করে না এমন নয়। কিন্তু নিজেও দায়ে পড়ে কিছুটা সতর্ক। আর বাড়াবাড়ি করার মতো ইন্ধনও কেউ জোগায় না।

দূর্বার মুখে কঠিন আঁচড় পড়তে লাগল। বোনকে বলল, খুলে দিয়ে আয়।

চাপা রাগে শেফালি মুখ ঝামটা দিল।—আমি পারব না, সঙ্গে আবার সেই কার্তিকও আছে কিনা কে জানে—তুই যা।

দূর্বা উঠে হাত ধুয়ে নিল। ওদিকে আবার অসহিষ্ণু হাতের ধাক্কায় বন্ধ দরজা কেঁপে উঠল। দূর্বা দরজা খুলল।

বাবা। হাতে কাগজে মোড়া বোতল। পরনের ট্রাউজার আর শার্ট জবজবে ভিজে। খেঁকিয়ে উঠল, ভর সন্ধ্যায় ঘুমোস নাকি সব—এতক্ষণ দরজা ধাক্কাচ্ছি কানে যায় না?

বছর তিন চার আগেও এই বাবাকে যমের মতো ভয় করত তারা। যতক্ষণ বাড়িতে থাকত, কাঁপত। শেফালি এখনো ভয় করে। দূর্বার ভয়-ডর এখন গেছে। আছে শুধু অফুরন্ত ঘৃণা। জবাব না দিয়ে

দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়ালো। অপলক কঠিন চাউনি বাবার মুখের ওপর।

কৃষ্ণেন্দু বোস ঘরে পা দিল। ভারী লালচে মুখ। চোখ দুটো সর্বদাই লাল। দেখলেই বোঝা যায় সুঠাম সুপুরুষ ছিল এক-কালে। তার পিছনে অমল বিশ্বাস। বাবার আপিসে তার আণ্ডারে চাকরি করে। তার দায়ে-পড়া গোছের হাসি-হাসি মুখ। দূর্বাকে বোঝাতে চায় তার কোনো দোষ নেই, গলায় গামছা বেঁধে আনা হয়েছে বলে এসেছে। বাপের অন্তরঙ্গ সহচর হলেও বয়সে দু'জনের কুড়ি একুশ বছরের তফাৎ। বাবাব উনপঞ্চাশ। এর আটাশ উনত্রিশ। বাবা তাব কাছে একজন আদর্শ পুরুষ। ভাবখানা তাকে আগলে রাখাব জন্যই সর্বদা তার সঙ্গে ছায়ার মতো ফেবে। সঙ্গে থেকেও মদ না খেলে বাবা চটে যায় বলেই খেতে হয়, নইলে এ জিনিসে তার একটুও আসক্তি নেই। বাবাকে বশ করার পিছনে তার মতলবখানা কি, দূর্বা কেন, অনেকেরই তা জানতে বাকি নেই।

নেশা করলে কৃষ্ণেন্দু বোসেব দাপট বাড়ে। আগে প্রায়ই তাকে চিৎকার করে বলতে শোনা যেত, তার ভাবী বড় জামাইকে কেউ হেলাফেলা কবলে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেবে। এ নিয়ে অনেক কাণ্ড অনেক কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে।

মেয়ের ধারালো মূর্তির দিকে চেয়ে কৃষ্ণেন্দু বোসের মেজাজ খিঁচড়ে গেল। কিন্তু আগেব দিন আর নেই সে-জ্ঞান আছে। ছোট মেয়ে হলে হাতের বোতল উঁচিয়েই মারার হুমকি দিত। বড় মেয়েকে ইদানীং একটু সামলে চলতেই হয়। উষ্ণ ঝাঁঝে মেয়েকে বলল, ও-রকম চেয়ে আছিস কেন, এত বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাব? নিজের ঘরে বসে চুপচাপ খাব, তাতে কার কি? যা নিজের কাজে যা— কোনো হল্লা-টল্লা না হলেই তো হলো!

নিজের ঘরে চলে গেল। পিছনে অমল বিশ্বাস।

দূর্বা আর শেফালি দু'জনেই চুপচাপ। হাঁড়িতে ডাল জ্বাল

চড়িয়ে শেফালি আনাজ-কাটা বঁটি দিয়ে কিছু আলু পটোল ছাড়াতে বসেছে। খিচুড়িতে ফেলে দেবে। দূর্বা আঁশ বঁটি দিয়ে মোটামুটি একটা হিসেব মাথায় রেখে মাছের টুকরো করছে। কারো মুখে কথা নেই। আনন্দের অর্ধেক মাটি কি তারও বেশি সেটা এখনো অনিশ্চিত।

তরকারি নিয়ে বসার আগেই শেফালি একটা ডিশে খানিকটা নুন আর আদা কুঁচিয়ে রেখেছিল। চাইতে এলো বলে। বাংলার সঙ্গে এ দুটো জিনিস লাগে। জল আর গেলাস বাবার ঘরেই থাকে। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে হাসি-হাসি মুখে অমল বিশ্বাস কাছে এসে দাঁড়ালো। শেফালি সঙ্গে সঙ্গে আদাকুঁচি আর নুনের ডিশ তার দিকে এগিয়ে দিল।

—বাঃ, একেবারে রেডি! দূর্বার দিকে চোখ যেতেই গলা দিয়ে সত্যিকারের বিস্ময় ঝরল, কি ব্যাপার, কোনো উৎসব টুৎসব নাকি? আমাদেরও ভাগে জুটবে তো?

আস্তে আস্তে মুখ তুলে দূর্বা সোজা তার দিকে তাকালো। ঠাণ্ডা কঠিন চাউনি। বলল, কিছু দেরি হবে, হয়ে গেলে দু'জনেরটাই ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি কিন্তু কোনরকম হৈ-হল্লা হলে সক্কলেরটা উনুনে যাবে।

অমল বিশ্বাস জোরে মাথা নেড়ে আশ্বাস দিল টুঁ-শব্দটি হবে না দেখে নিও—ওই জন্যেই তো আমি সঙ্গে এলাম—এত দিনেও আমি তোমাদের মন বুঝি না ভাবো?

দূর্বার চোখ আবার মাছের দিকে ফিরল। কথা বাড়ালে এই লোক এখান থেকে সহজে নড়তে চাইবে না জানে। ও-দিক থেকে কৃষ্ণেন্দু বোসের হাঁক শোনা গেল, কই রে—!

অগত্যা লুব্ধ চাউনি তার তপ্ত মুখ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ঘরে চলে গেল। শেফালি একটুও শব্দ না করে হেসে উঠল। দূর্বা তা-ও টের পেল। মুখ তুলে তাকাতে ফিসফিস করে বলল, গঙ্গার ইলিশ

আবার একটা জিনিস—ওর কাছে তার থেকে ঢের ভালো জিনিস তোর মুখখানা।

হঠাৎ-হঠাৎ যে মুখ আর চোখ দেখলে শেফালি একটু ঘাবড়ে যায়, দিদির এই মুহূর্তে সেই মুখ আব সেই চোখ। তাড়াতাড়ি আনাজ ছাড়ানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দূর্বা আর মুখে কিছু বলল না ওকে। ভিতরটা বিষিয়ে গেছে। ছ' বছরের বড় বোনের সঙ্গে এ-বকম রসিকতা করার কথা নয়। কিন্তু ওর কি দোষ। সবটাই এ-বাড়ির হাওয়ার দোষ।

হারুকে খবর না দিয়ে দূর্বা দাদুর একলার খাবারটাই নিয়ে এলো। দেখা মাত্র দাদু সকোপে ঘোষণা করল, খাব না—যা।

—দেখো, আমার মেজাজ-পত্র ভালো না। শেফালিটার উৎসাহে এ সব হলো, ওকে ফেলে খাই কি করে। তুমি খাও, আমি বসছি।

গম্ভীর মুখখানার দিকে চেয়ে রাধাকান্ত মিটিমিটি হাসছেন।—মেজাজ ভালো না কেন, চাকরিটা হলো না বলে?

দূর্বা জবাব না দিয়ে দাদুর সামনে থালা বাটি সাজিয়ে দিতে লাগল। চাকরির ব্যাপারে হতাশাটা নতুন কিছু নয়। ভিতরটা হঠাৎ কেন এত খিঁচড়ে গেল নিজেও জানে না।

ইলিশ মাছের পরিমাণ দেখে রাধাকান্ত আঁতকে উঠলেন।—করেছিস কি, এই বুড়ো বয়সে মারবি নাকি আমাকে।

ঠাণ্ডা গলায় দূর্বা বলল, অত এনেছ কেন—শুরু করো তো।

রাধাকান্ত একটা মাছ ভাজা আর অর্ধেক ডিম ভাজা আলাদা সরিয়ে রাখতে রাখতে জিগ্যেস করলেন, তোদের সকলের জন্য ঠিক-মতো আছে তো?

—অনেক আছে।

হৃষ্ট বদনে খেতে শুরু করে রাধাকান্ত বললেন, তোর মেজাজ ভালো করার একটা ওষুধ পেয়ে গেছি—এখন তুই সেটা গিলবি কিনা বুঝছি না।

ভনিতা শুনে দূর্বার মনে হলো, দাছু কোনো সুপাত্র-টাত্রর কথা বলবে। দাছুর খাওয়ার সময় রাগারাগি করার ইচ্ছে নেই বলেই চুপ করে রইল। একটুও আগ্রহ দেখাল না।

কিন্তু দাছুর মুখের হাসিটা অন্যরকম লাগল। তুই এক গরাস খেয়ে আবার বললেন, দেখ্, খারাপের সবটাই খারাপ নয়—আজ বাসে যে ছেলেটা তোর ফোটো তুলে নিয়েছে বললি, আমার মনে হলো সে রণিতই হবে। তাই থেকে যে বাড়িতে ওর হামেশা যাতায়াত তাদের কথা মনে পড়ে গেল। তুই চলে যাবার পর সেই বাড়ির গিন্নির সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তাও হয়ে গেল। যদি রাজি থাকিস এবারে আর ফিরতে হবে না—কাজটা হয়েই যাবে—কাল তোকে পাঠিয়ে দিতে বলেছে।

দূর্বা এতক্ষণে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।—স্কুলের কাজ না?

—না, বাড়ির কাজ।

দূর্বা ভেবাচাকা খেয়ে গেল একটু। দাছু ওকে বাড়ির কি কাজে পাঠানোর কথা ভাবতে পারে!

—বসেই তো আছিস, গিয়ে দেখ্ না কেমন লাগে। সে-রকম ভালো কাউকে পেলে পাঁচশ টাকা পর্যন্ত মাইনে দিতে রাজি তারা।

টাকার অংকটা প্রায় অবিশ্বাস্য ঠেকল দূর্বার কানে। আজ যেখান থেকে নিরাশ হয়ে ফিরেছে সেখানেও মাইনে সর্বসাকুল্যে আড়াইশ'। অথচ দাছু এমনভাবে বলছে যেন এ চাকরি একেবারে হাতের মুঠোয়। ব্যস্ত হয়ে উঠল, বাড়ির কি কাজ তাই তো বলছ না?

—যোল বছরের একটা অসুস্থ ছেলের জন্য হোল-টাইম কম্পেনিয়ন দরকার তাদের—হোল-টাইম বলতে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা। তুপুরের খাওয়াটা—বড়লোকের বাড়িতে খাওয়া বলে না লাঞ্চ বলে—সেটাও তারাই দেবে।

শুনে দূর্বা হাঁ খানিক।—আমি নার্সিংয়ের কি জানি!

—নার্সিং বললাম নাকি তোকে? ইনভ্যালিড ছেলের একটি সারাক্ষণের কম্‌পেনিয়ান দরকার—সর্বক্ষণ তার কাছে থাকতে হবে, গল্প করতে হবে—বই-টই পড়ে শোনাতে হবে—এই সব। তুই রাজি থাকলে আর তাদেবও মনে ধরলে তাদের বলে ওই মাইনে আমিই আরও বাড়িয়ে দিতে পারব।

এরপর সাগ্রহে বিস্তারিত শুনল দূর্বা। বাবা আজ ঘরে বসে মদ খাচ্ছে বা শেফালি তার জন্যে অপেক্ষা করছে, তারও মনে থাকল না। ···রাজি থাকলে বালিগঞ্জের যে ঠিকানায় ওকে যেতে হবে তার নাম সরকার লজ্। বাড়ির কর্তা নিখিলেশ সরকার মস্ত অবস্থার মানুষ —ডালহৌসীর সরকার মোটরস-এর মালিক। বিলেত ফেরৎ অটো-মোবাইল এন্‌জিনিয়ার। ভদ্রলোকেব বয়েস এখন বাষট্টি তেষট্টি হবে। তার বাপের ছোট-খাট মোটর পার্টস-এর দোকান ছিল। নিখিলেশ সরকারের এনজিনিয়ার কাকা দাতুব অন্তরঙ্গ সহপাঠী ছিলেন। দু'জনে এক স্কুলে এক কলেজে পড়েছেন। আর নিখিলেশ সরকারও দাতুর গোড়ার দিকের ছাত্র ছিলেন। তাঁব কাকা অর্থাৎ বন্ধুর অনুরোধে ম্যাট্রিক পর্যন্ত তাঁকে বাড়িতেও পড়িয়েছেন। কাকা এনজিনিয়ার হলেও দাতুর জ্যোতিষীর ওপর বেজায় আস্থা ছিল। তাঁর আগ্রহে নিখিলেশ সরকারের ঠিকুজি দেখে দাতু বলেছিলেন, কালে দিনে ওই ছেলে স্বাধীন ব্যবসায় মস্ত একজন হবে। আসলে দাতু নাকি তখন ভালো ছাড়া মন্দ বড় কাউকে বলতেন না। যা-ই হোক, সেই ভবিষ্যদ্বাণীও লেগে গেল। নিখিলেশ সরকার বিলেতে এনজিনিয়ার হতে গিয়ে হয়ে এলেন অটোমোবাইল এনজিনিয়ার। এ-জন্যে কাকার সঙ্গে মন কষাকষিও হয়ে গেছল। তিনিই তাঁকে খরচ-পত্র করে পাঠিয়ে-ছিলেন। ফিরে আসার পর মোটামুটি ভালো চাকরি পেয়েও তাঁর মন ওঠেনি। মাস্টারমশায় অর্থাৎ দাতুর ভবিষ্যদ্বাণী মাথায় ছিল। দু'চার দিন বাদে বাদে এসে দেখাও করেছেন তাঁর সঙ্গে। ও-দিকে বাপের মোটর পার্টস-এর ব্যবসায় যোগ দিয়েছেন। তাঁর কাকার

রাগও দাদুই ঠাণ্ডা করেছেন। শুধু তাই নয়, দাদুর কথার ওপর নির্ভর করে ব্যবসা বাড়ানোর জন্য সেই দিনে ভাইপোকে তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত দিয়েছিলেন।

সেই থেকেই এখন এত বড় অবস্থা। ভদ্রলোকের বাবাও আর বেঁচে নেই, কাকাও না। নিখিলেশ সরকার ছাত্রকাল থেকেই দাদুকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন খুব, পরে সেটা আরো ঢের বেড়েছে। অবস্থা ফেরার পর দাদুকে কতভাবে কত কিছু দিতে চেয়েছেন, কিন্তু দাদু দাবড়ানিও দিয়েছেন আবার বুকে টেনেও নিয়েছেন। ছাত্র নিখিলেশ সরকারের স্ত্রী নির্মলা সরকারও বড় ঘরের মেয়ে। তাঁদের আভিজাত্যের চটক শ্বশুরবাড়ির থেকেও বেশি। নিখিলেশ বিলেত ফেরৎ না হলে ও মেয়ে এ-ঘরে আসতেন কিনা সন্দেহ। স্বামীর মুখ থেকে শুনেই হোক বা যে কারণেই হোক দাদুর ওপর তাঁরও গোড়া থেকেই খুব ভক্তি শ্রদ্ধা। নিখিলেশ সরকার তেমন সময় পান না, দাদুর সঙ্গে যোগাযোগ বেশি তাঁর স্ত্রীটির। বাইরের আদব-কায়দা যেমনই হোক, ভাগ্যের ব্যাপারে চাপা দুর্বলতা অনেকেরই। সেই কারণে, আপদ বিপদের ছায়া দেখলেই মহিলা টেলিফোনে অথবা লোক পাঠিয়ে দাদুর শরণাপন্ন হন। অত টাকা অমন অবস্থা, কিন্তু শান্তি খুব নেই। সব থেকে খারাপ ওদের সন্তান ভাগ্য। তিনটে ছেলে আর দুটো মেয়ে ছিল। বছর ছ'সাত আগে একটা তাজা ছেলে অ্যাকসিডেন্টে বেঘোরে মারা গেল। বছর তিনেক হলো ছোট ছেলেটার ভয়ংকর রোগ ধরা পড়েছে। লিউকিমিয়া। এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই, বাঁচেও না। মাঝে মাঝে রক্ত দিতে হয়। দাদু অনেকবার দেখেছে, ভারী মিষ্টি ছেলেটা, সব সময় বোঝাও যায় না এমন একটা মারাত্মক রোগ নিয়ে বসে আছে।

শুনে মনটাই খারাপ হয়ে গেল দুর্বার। বাঁচবে না এমন একটা ছেলের সঙ্গে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত লেপটে থাকতে হবে...। জিগ্যেস করল, আর অন্য ছেলে আর মেয়েরা?

—তাদেরও মর্তি-গতির ঠিক নেই। গেলেই টের পাবি।

দূর্বা জিগ্যেস করল, তাহলে আমাকে পাঠাতে চাইছ কোন্ ভরসায়?

কি বলতে চায় বুঝে রাধাকান্ত বললেন, সে-রকম ভয়ের কিছু নেই, ওই ছেলে-মেয়েরাও আমাকে ভালোই জানে। অসম্মান করবে মনে হয় না···তাছাড়া তোকেও তো চিনি—ঠিক বুঝে শুনে চলতে পারবি।

একটু চুপ করে থেকে দূর্বা জিগ্যেস করল, আজ যে আমার ফোটো তুলল এর মধ্যে সেই ছেলে এলো কোত্থেকে?

কোত্থেকে এলো শুনল। সরকারদের যে ছেলেটা অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছে, রণিত দত্ত তার প্রাণের বন্ধু ছিল। ও-বাড়ির ঘরের ছেলের মতোই হয়ে গেছে। খেয়ালখুশি মতো ওদের কাছে এসে থাকেও। বিশেষ করে ওই অসুস্থ ছেলেটার ওপর তার নাকি খুব টান। নিজের ছেলে মেয়েদের দিয়ে কুটোটি নাড়াতে পারেন না নির্মলা সরকার, তার দরকারে রণিত ভরসা। তাদের মস্ত গাড়ি হাঁকিয়ে মাসে একবার হু'বার ওই রণিত দত্ত দাহুকে নিয়ে যেতে আসে।

শোনার পর দূর্বার মনে পড়ল। গাড়িও দেখেছে, রণিত দত্তকেও দেখেছে।

রাধাকান্ত বললেন, ও-ছোঁড়ার কথা না উঠলে তো ভুলেই গেছলাম—এই দিন দশেক আগে এসে বলে গেছল মিসেস সরকার ছেলের জন্য ভালো একজন কমপেনিয়ন খুঁজছে, জানা-শোনা তেমন কেউ আছে কিনা।···পালা করা নার্স দিয়ে সুবিধে হচ্ছে না, তারা আপনার জনের মতো হয়ে উঠতে পারে না। ডাক্তারও পরামর্শ দিয়েছে নার্স দরকার নেই, ওর মনের মতো একজন সঙ্গী বা সঙ্গিনী দরকার। তোর কথা তখন অবশ্য একবারও মনে হয়নি আমার···। গিয়ে দেখ্ না, ভালো লাগতেও পারে, ছেলেটার জন্যে সত্যি খুব মায়া হয় আমার।

দূর্বা বলল, মাসে যা দেবে শুনে তো আমারও ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু যে রোগের কথা বললে···চোখের সামনে দু'চার মাসের মধ্যে কিছু হয়ে গেলে বিচ্ছিরি লাগবে।

রাধাকান্ত আশ্বাস দিলেন, না রে না, পয়সার জোর আছে, চিকিৎসার অন্তত ত্রুটি হবে না—দু'চার মাস ছেড়ে দু'দশ বছরও টিকে যেতে পারে, আর তার মধ্যে এ-রোগের চিকিৎসা কিছু বেরিয়ে যাবে কিনা কে বলতে পারে।

শুনে দূর্বা সত্যি উৎসাহ পেল।—ঠিক আছে, তোমার চিঠি নিয়ে আমি কালই দেখা করব।

॥ তিন ॥

বাইরে থেকে দেখলে দূর্বা বোসের ভিতরের আঁচ কেউ কল্পনা করতে পারবে না। বাইরে থেকে দেখার লোক অনেক আছে। সব থেকে বেশি দেখে পাড়া-প্রতিবেশীরা। বছরের পর বছর ধরে দেখে এসেছে। এখনো দেখছে। পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত তাদের নিয়ে ঘরে ঘরে কানাকানি ঠাট্টা-বিদ্রূপ আর মুখ চুলকনো দরদের অন্ত ছিল না। এখন আর দরদের ছিটে ফোঁটাও নেই। দূর্বা বোসের কানে না এলেও কানাকানি ঠাট্টা-বিদ্রূপ আগের থেকে কিছুমাত্র কমেনি সেটা বেশ বুঝতে পারে। পাশের বাড়ির দাপটের দাদু না থাকলে কবেই তাদের পাড়া-ছাড়া হতে হতো। ভাগ্য গোনার দৌলতে দাদুকে সমীহ করে না পাড়ায় এমন বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় কেউ নেই।

(ভিতরের আগুন অতি নিরীহ জনকেও একসময় বিদ্রোহী করে তোলে।) ছেলেবেলা থেকে দূর্বা বোসের বুকের তলায় সেই আগুনই জ্বলছে। জীবনের প্রতিটা দিনকে ধিক্কার দিয়েছে। জন্মটাকে

অভিসম্পাত করেছে। চার বছর আগেও রাস্তায় চলতে যে মেয়ে মুখ তুলে কোনো দিকে তাকাতো না, মাটিতে চোখ নামিয়ে স্কুল কলেজ যেত—ফিরত, তার চলা-ফেরাটা পাড়া পড়শীর চোখে উদ্ধত নির্লজ্জ মনে হয় এখন। তাদের বিবেচনায় উল্টো হবার কথা। মাটির সঙ্গে আরো মিশে থাকার কথা। পাড়ার সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা আগেও ছিল না, এখনো নেই। আগে ছিল না কারণ মুখ ছিল না। যা ঘটে গেছে, সেই মুখে ডবল কালি পড়ার কথা। অথচ মেয়ে এখন সটান সোজা হয়ে চলে, কারো দিকে বা কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আড়ালে আবডালে বা সোজাসুজি চোখের ভাষায় অনেকে বলে, মা ভালো পথ দেখিয়ে গেছে, আর ভাবনা কি! বয়স্কা পড়শিনীদের বরং জোয়ান বয়সের ঘরের ছেলেকে এই মেয়ের সংস্রব থেকে আগলে রাখার চেষ্টা। সে চেষ্টাও খুব যে সফল এমন নয়। তবু নিজের ছেলের দোষ কে দেখে। এই মেয়েই চক্ষুশূল।

দাদুকে বাদ দিলে দুনিয়ার কোনো মানুষকে কি দূর্বা বোস ভালবেসেছে? বুকের তলার মরুভূমিতে কোনো নরম দাগের অস্তিত্ব নেই তার। তবে দরদ ছিল, তার থেকে বেশি অনুকম্পা ছিল একজনের প্রতি। মা। সেই মা-কে সে এখন ভক্তিশ্রদ্ধা না করুক, মনে মনে তারিপ করে। সমস্ত সত্তা দিয়ে ঘৃণা করে এসেছে—এখনো করে, শুধু একজনকে। বাবা। কোনো মেয়ের জীবনে এতবড় লজ্জা এতবড় অভিশাপ আর হয় কিনা দূর্বা বোস জানে না।

জ্ঞান বয়েস থেকে মায়ের কান্না দেখে এসেছে। তারও আগের কথা মনে নেই। কিন্তু এটুকু জানে বাবাকে তার ঢের আগে থেকেই বিভীষিকার চোখে দেখত। মায়ের নাম সুতপা। কে রেখেছিল এমন নাম জানে না। জীবনভোর মায়ের মতো তপে জ্বলতে আর কাউকে দেখেনি। শোনেও নি। মায়ের দুটো অভিশাপ। এক বাবা। দুই রূপ। ম্যাট্রিক পাশের আগে রূপ দেখে মা-কে ঘরে আনা

হয়েছিল। বাবারও সুঠাম স্বাস্থ্য। লম্বা, সুপুরুষ। গায়ে কত শক্তি রাখত। তার মেজাজের মুখ আট দশ বছর আগেও দূর্বা দেখেছে আর ভয়ে কেঁপেছে। সকলের চোখের ওপর বাড়ির মুখোমুখি কাবুলিওয়ালা টাকার তাগিদে বসে থাকত। বাবা দিন কয়েক সহ্য করেছে, নিষেধ করেছে, তারপর একদিন বেরিয়ে এসে ওদেরই লাঠি কেড়ে নিয়ে একসঙ্গে দু'জনকে বেধড়ক ঠেঙিয়েছে। পাড়াসুদ্ধু টি-টি পড়ে গেছে। দূর্বারা ক'দিন বাড়ির বাইরে মুখ দেখাতে পারেনি। কাবুলিওয়ালা ছাড়া আরো অনেক পাওনাদারকে মার-ধর খেতে দেখেছে তারা। বাবা বার কয়েক বলে, হাতে টাকা নেই এখন, এলে দেব। কিন্তু পাওনাদার ক'বার এমন কথা শুনতে রাজি? তাদের মুখ দিয়ে কটূক্তি বেরিয়ে আসেই। সঙ্গে সঙ্গে হাত আর কব্জির জোরে অপমানের ফয়সলা। পাড়া-মাতানো জটলা আর কটূক্তি। সামনে বা বাবার মুখোমুখি নয়। তার আড়ালে। সে-সব মায়ের কানে আসত, দাদার কানে আসত, দূর্বার কানে আসত। কিন্তু বাবার কাছে নালিশ করবে কে? বাবারও তখন সাঙ্গপাঙ্গ কম নয়। বাবার মতো অতটা না হলেও তারাও বেপরোয়া বটেই।

পাড়ার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত সকলেই জানত, কৃষ্ণেন্দু বোসের ভেতর-বার সবটাই কালো—ইন্দু কোথাও নেই। দূর্বা বা দাদা বা তাদের মা ঘরে বসে সেই কালের আবর্তে খাবি খেত। দূর্বা ভেবে পেত না অকারণে মানুষ এমন নৃশংস কি করে হয় বা কেন হয়। বয়েসকালে বাবা ভালো স্পোর্টসম্যান ছিল শুনেছে। মরচে ধরা তার কত কাপ মেডেল ঘরে পড়ে আছে। ওদিকে অনার্স ডিগ্রী। ভালো চাকরি পেয়ে যেতে আর এম. এ. পড়েনি। কাগজে কলমে এখন তো দস্তুরমতো ভালো মাইনে। আপিসেও মদ খাওয়া রেস খেলা আর ধারে ডোবার দুর্নাম না থাকলে এতদিনে অনেকের মাথার ওপর বসে থাকত। এখনো মাস গেলে মাইনে

হিসেবে যে-টাকার অংকে সই করে তা ঘরে এলে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার কথা।

মায়ের বিয়ে দিয়েছিল মামারা। তাদের দোষ খুব নেই। তারা সুপাত্রই ধরে নিয়েছিল। বিয়ের আগে থেকে বাবা যে মদ খেত, ভালো করে খোঁজ খবর নিলে জানা যেত কিনা দূর্বা বলতে পারে না। মদ সঙ্গী বাবার খেলোয়াড় জীবন থেকে। তারপর রেস এসেছে, জুয়া এসেছে। বারো তেরো বছর বয়সেই লোকের কানাকানিতে হোক বা যে-করেই হোক, দূর্বা এ-ও জেনেছে, এ-সব ছাড়াও বাবার অন্য দোষ আছে। আরো একটু বড় হবার পর ওর অবাক লাগত, মা তাদের এখনো এত সুন্দর দেখতে অথচ তাকে ছেড়ে বাবা কুচ্ছিত রাস্তা মাড়ায় কেন!

ছেলেবেলা থেকে মার খেয়ে খেয়ে দূর্বা আর তার দাদার হাড় শক্ত হয়ে গেছল। বাবা মারত, আবার নিষ্ফল আক্রোশে মা-ও সময় সময় বেদম মারত। দূর্বা আবার দাদাকেও দু'চক্ষে দেখতে পারত না। কারণ, মাত্র দু'বছরের বড় দাদা একটু ছল ছুতো পেলেই ওকেও ধরে ঠ্যাঙাতো। দূর্বা ভাবত, বড় হলে দাদাও ঠিক বাবার মতো হবে। বাবার মতো নিষ্ঠুর হবে।

কিন্তু সব থেকে বেশি মার খেত মা নিজে। শুধু মার নয়, সেই সঙ্গে বাবার কুৎসিৎ ইতর গালাগালি কানে আসত। এমনও অনেক দিন হয়েছে, রাতে ভাই বোনেরা খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মায়ের চাপা আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেছে, মদে মত্ত বাবা ক্ষেপে গিয়ে মা-কে তাড়া করছে। মার খেতে খেতেও মায়ের সবার আগে ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করার তাড়া। আশপাশের বাড়ির লোক শুনতে না পায় বা বুঝতে না পারে। কিন্তু তারা শুনতেও পেত, বুঝতেও পারত। তাদের ঘরের জানলা বন্ধ হতো, আর অন্য বাড়ির বন্ধ জানলাও খুলে যেত।

...হঠাৎ-হঠাৎ ঠাস-ঠাস চড়ের শব্দ কানে আসত। ওরা ছেড়ে

বাচ্চা বোন শেফালিও ভয়ে কাঠ হয়ে যেত। দূর্বা আড়াল থেকে দেখত মায়ের ফর্সা গালে টকটকে আঙুলের দাগ। কিন্তু সব-কিছুর আগে একটুও শব্দ না করে মা ঘরের জানলা বন্ধ করতে ছুটেছে। বাবার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। চুলের মুঠি ধরে মাকে টেনে এনে মেঝেতে ফেলে এলোপাথাড়ি পিটছে। সেই সঙ্গে অশ্রাব্য গালাগাল। মা-কে দূর্বা সব সময় অনুনয় করত, দাদাও বলত, মদ খেয়ে ঘরে ফিরলে মা যেন একটি কথাও না বলে। কিন্তু মা তখন ওদেরই মারতে আসত। কিন্তু মা যে কোন্ দায়ে বাবার মুখোমুখি হয় তাও জানত। কিছু টাকা ছিনিয়ে নিতে না পারলে ছেলে মেয়ের মুখে কি দেবে? মাসের শেষের পনের দিন তো শুধু ডাল-ভাত আর সেদ্ধ ভাত ছাড়া এমনিতেই আর কিছু জোটাতে পারে না।

বাবাকে কিছু দিনের জন্য দূর্বা প্রথম একটু স্তব্ধ হয়ে যেতে দেখেছিল বছর আটেক আগে। এই বাংলার রাজনীতিতে তখন ধুন্ধুমার কাণ্ড চলেছে। নক্সালবাড়ি খৈরিবাড়ির আগুন কলকাতায় পৌঁছে গেছে আরো একবছর আগে।

সেই খুনোখুনির রাজনীতি কলকাতার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সুযোগ সুবিধে বুঝে যারা আন্দোলনের 'আ' বোঝে না এমন সব সমাজবিরোধীরাও ছোট বড় দল বেঁধে নিজেদের নক্সাল বলে ঘোষণা করছে, লুঠতরাজ মারামারি কাটাকাটিতে মেতে উঠেছে। সব থেকে শস্তা তখন মানুষের জীবন। নিলেই হলো। বড় বড় সরকারি চাকুরে ব্যবসায়ী বিচারক শিক্ষাবিদরাও শিকারের লক্ষ্য। এমন দিনে হঠাৎ দাদা বাড়ি থেকে উধাও। দূর্বার বয়েস তখন পনের, দাদা গৌতম বোসের সতের। আগের বছর স্কুল ফাইন্যালে ফেল করে পড়া ছেড়েছে। ঠেঙিয়ে আধমরা করেও বাবা তাকে আর স্কুলে পাঠাতে পারেনি। বাবা তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে। মায়ের ওপর হুকুম, ওকে বাড়ির ভাত খেতে দিলে কেউ আস্ত থাকবে না।

রাগ না পড়া পর্যন্ত দাদাকে কোনো বন্ধুর আশ্রয়ে থাকতে হয়েছে। দাদার বখাটে বন্ধুর সংখ্যা তখন কম নয়।

দাদা নিখোঁজ হবার পর মা অবশ্যই উতলা। কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বলেনি। আকণ্ঠ মদ গিলে রাতে বাড়ি ফিরে রোজই একবার করে খোঁজ করেছে, ফিরেছে ? ফেরেনি শুনে বলেছে, চুলোয় যাক।

দিন দশেক বাদে সেই দাদার সঙ্গে দূর্বার একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখা। দেখা করার জন্য দাদাই ওঁত পেতে দাঁড়িয়েছিল। ওকে একটু নিরিবিলিতে টেনে নিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করল, বাড়ির খবর কি ?

দূর্বা জবাব দিল, এক রকমই। তুই অ্যাদ্দিন বাড়ি ছেড়ে কোথায় পড়ে আছিস ?

—চুপ! শোন, পুলিশ আমাকে খুঁজছে, পেলেই খাঁচায় নিয়ে পুরবে। আমাব সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে এক মা-কে ছাড়া আর কাউকে বলবি না। তিরিশটা টাকা হাতে গুঁজে দিল।—সাবধানে নিয়ে যা, মায়ের হাতে দিবি. আর বলবি তার দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। বাবা হয় বদলাবে নয়তো শ্মশানে যাবে। বাবার সঙ্গে খুব শিগগীরই আমাদের বোঝাপড়া হয়ে যাবে।

দূর্বা হাঁ প্রথম। তারপরেই ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল তার। এই দশ দিনের মধ্যে মাত্র দু'বছরের বড় দাদা ওর থেকে যেন ঢের বড় হয়ে গেছে। নক্সাল নামটাই শুধু মুখে মুখে শোনা, দূর্বা তাৎপর্য কিছু বোঝে না। সভয়ে জিজ্ঞাসা করল. আমাদের মানে আর কারা ? তুই কি নক্সাল হয়ে গেছিস নাকি ?

—চুপ! আস্তে কথা বল্।···চেষ্টা করছি। এখনো ওদের হদিস পাইনি। নিজেরা একটা দল গড়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। খবরদার! কারো কাছে টুঁ শব্দটি করবি না—চলে যা।

দূর্বা কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরল। মায়ের হাতে টাকা দিল। বলল সব। দাদার দেওয়া টাকা মা ব্যবহার করেনি সেটা অনেক

পরে জেনেছে। বাবার মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিয়েছে। সে-রকম মন্ত্র জানা থাকলে বাবাকে মেরে ফেলত—দূর্বা এ-রকম কত ভেবেছে। কিন্তু এখন বাবার দিকে তাকালেই কেবল দেখে তার কাঁধের ওপর মাথাটা নেই। বাবার জন্যে মায়া দয়া তখনো এক ফোঁটা নেই, কিন্তু কি একটা ভয় একেবারে ছেঁকে ধরে আছে। কত বার ভেবেছে দাদুর কাছে ছুটে যায়, দাদুকে সব বলে। দাদা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে এ-তো দাদু ওর মুখে কবেই শুনেছে, রোজই একবার করে ডেকে দাদার খোঁজ নেয়। দাদুকে জানালে সে-তো আর কাউকে কিছু বলবে না। কিন্তু অবুঝ ভয়টা শেষ পর্যন্ত এমনিই যে দাদুকেও বলতে পারেনি।

দিন চারেক বাদে দূর্বা লক্ষ্য করল, বাবা সন্ধ্যার কিছু পরে ট্যাক্সি করে ফিরল। সমস্ত মুখ ভীষণ থমথমে। বাইরে মদ খেলে রাত এগারোটার আগে ফেরে না। বাড়িতে মদ খেলে সঙ্গে গেলাসের ইয়ারবন্ধু কেউ না কেউ থাকেই। সঙ্গে কেউ নেই। রাত বাড়তে থাকল, মদও খেল না। কারো সঙ্গে একটা কথা নেই। রাতের খাওয়ার পরে বাইরের ফুটপাথ-এ অনেকক্ষণ পায়চারি করল। দূর্বা মায়ের মুখের দিকে তাকাল। মা ওর দিকে।

পরদিনও তাই। তার পর দিনও। পর পর পাঁচ দিন আপিসের পর বাবাকে সোজা বাড়ি ফিরতে দেখল। মদ খেল না। মারা দূরে থাক, মায়ের বা দূর্বার সঙ্গে কথাই বলল না। মদ না খাওয়ার ফলও দূর্বা দেখছে। তাকালেই মনে হয় সমস্ত রাত ঘুমোয় না। ঘোলাটে চোখ। মাঝে মাঝে মা-কে আর ওকে দেখে। কিছু একটা সন্দেহ মাথায় ঢুকেছে। সেই তাকানো দেখলে মনে হয়, গিলে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু কিছুই করে না, কিছুই বলে না।

দু'বছরের বড় দাদার ওপর ভক্তিশ্রদ্ধা দারুণ বেড়ে গেল দূর্বার। দাদা নিশ্চয় এমন কিছু করেছে যার ফলে বাবা ঢিট একেবারে।

কি করেছে পরদিনই জানা গেল। দাদা সেদিনও স্কুলের গেট

থেকে একটু দূরে ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। ইশারায় কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল, বাবাকে কেমন দেখছিস? মায়ের বা তোর গায়ে এব মধ্যে একদিনও হাত তুলেছে?

দূর্বার ভিতরে উত্তেজনার স্রোত বইছে। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, একদিনও না। গত পাঁচ দিনের মধ্যে মদও ছোঁয়নি! তুই কি করে বাবাকে এমন করলি দাদা? বাবা এখন থেকে এ-রকমই থাকবে?

দাদার চোখে মুখে বিজয়ীর হাসি। বলল, না থাকলে সোজা কেওড়াতলা চলে যাবে—মদ ছাড়ার জন্য আমি সাত দিন সময় দিয়েছিলাম, সত্যি একদিনও খায়নি?

দূর্বা আবার মাথা ঝাঁকালো।—আমরা তো টের পাইনি।

দাদার বয়েস হাজার হোক সতের মাত্র। এমন বাহাদুরির ব্যাপারটা বোনকে না বলে পারেনি।

···দলের মধ্যে দাদা সকলের ছোট হলেও তাকে কেউ হেলাফেলা করে না। এর মধ্যে সে তিন-চারটে ভয়ংকর সাহসের পরিচয় দিয়ে সক্কলের খুব খাতিরের একজন হয়ে উঠেছে। বাবাকে ধরার আগে কি করা হবে না হবে সেটা ঠিক করাই ছিল। বুকে ছুরি ঠেকিয়ে সক্কলে তাকে মেরে ফেলতেই চাইবে, দাদাই এ-যাত্রা বাবার প্রাণ ফিরিয়ে দেবে।

বাবাকে কোথায় বাগে পাওয়ার সুবিধে দাদার তাও জেনে নিতে অসুবিধে হয়নি। বাবা মাঝে মাঝে এক খারাপ মেয়েলোকের বাড়ি যায়। সেই রাস্তাটাও ভালো না। ছ'সাতটা ছেলে মিলে বাবার ওপর হঠাৎ চড়াও হয়ে তার মুখ কষে বেঁধে ফেলল, তারপর দাদা যে নিরিবিলি জায়গাটায় অপেক্ষা করছিল সেখানে টেনে নিয়ে এলো। তাদের সকলের হাতে ছোরা, কারো হাতে টর্চ। দাদার হাতেও টর্চ। বাবাকে মাটিতে ফেলে ছোরা হাতে একজন তার বুকের ওপর চেপে বসল।

দাদার হি-হি হাসি। বাবার তখনকার মুখ যদি দেখতিস! সেই

ছেলেটা বাবার পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে মদের বোতলটা বার করে ছিপি খুলে তার মাথায় কপালে চোখে ঢেলে দিয়ে বলল, শেষ খাওয়া খেয়ে নিন। তারপর ছোরা উঁচিয়ে ধরল।

তখন দাদা এসে তাকে থামালো। বাবাকে বলল, আমার বাবা বলে দুটো শর্তে বাঁচার একটা সুযোগ তুমি পাবে। এক, মা বা বোনেদের কারো গায়ে হাত তুলবে না বা কাউকে বকাবকি করবে না। দুই, আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে মদ ছাড়বে।

বাবাকে যারা চেপে ধরে ছিল, বা যে ছোরা হাতে বুকে চেপে বসেছিল তারা সকলেই খেঁকিয়ে উঠেছিল। একজন বলে উঠেছিল, বাগে যখন পেয়েছি, খতম করে দিই না—এই লোক কথা দিলেও কথা রাখার মানুষ? হাজার ধুলেও কয়লার ময়লা ওঠে? সব শেখানো বুলি।

দাদাদের লিডার তখন বলেছে, গৌতমের বাবা বলে একবার মাপ করা যেতে পারে—এই ওয়ার্নিং রইল, ছেড়ে দে। আর দাদা বলেছে, তোমার নাড়ি-নক্ষত্র খবর আমি রাখি আর রাখবও। যা বললাম একটু এদিক ওদিক হলে আমি জানতে পারব। তখন শ্মশানে মুখাগ্নি করে ছেলের কর্তব্য করব।

এরপর ঠিক হাতে গোনা চার দিনের দিন আবার শ্মশানেই দেখা হয়েছে তাদের। দাদা বাবাকে দেখেছে কিনা দূর্বাও জানে না। বাবা দেখেছে। বাবা দাদার মুখাগ্নি করেছে।

পুলিশী তৎপরতার খুঁটিনাটি না জানলেও ধর-পাকড়ের হিড়িক পড়ে গেছল দূর্বাও জানত। দাদা কোনো দুর্ধর্ষ দলে ভিড়ে গেছে দূর্বা এটুকুই জানত। আর তারপর থেকে খবরের কাগজে নক্সালদের কোনো খবর দেখলেই খুঁটিয়ে পড়ত। দূর্বার ভিতরে ভিতরে সারাক্ষণের উত্তেজনা। বাবা কেন অমন ঢিট হয়ে আছে, মা-কে চুপিচুপি বলেছে। চাপা ফুর্তিতে টইটম্বুর ও। কিন্তু মা এমন একটা খবর পেয়েও কেন যে একটুও খুশি না, উল্টে সমস্ত মুখে বিষাদের কালি—ভেবে পাচ্ছিল না।

দূর্বারও বুক দুরু দুরু। কারণ, কাগজে দেখেছে কলকাতার ছ'হাজার নক্সালের মধ্যে চার হাজার ধরা হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ে অনেকে মরেছে। কলকাতার আশপাশে আর বাইরে আরো হাজার হাজার নক্সাল আছে বটে—তাদেরও ছেঁকে তোলার চেষ্টায় পুলিশ আদা জল খেয়ে লেগেছে। নক্সালদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে পুলিশ সমস্ত কলকাতায় ঘাঁটি করে বসেছে, প্লেন ড্রেসে পুলিশ আর সি-আই-ডি ঘুরছে। পুলিশেরও খুন-জখম হয়েছে পাঁচশ'র কাছাকাছি। একের বদলে তারা চারের মাথা নেবে পণ করেছে। কে নক্সাল কে-বা নয় অত খুঁটিয়ে বিবেচনা করার ধৈর্য নেই তাদের। ফলে সন্দেহ হলেই গুলি।

আগের দিন সন্ধ্যায় একজন অচেনা লোক বাড়িতে এসে খবর দিয়ে গেল, ঘণ্টাখানেক আগে পুলিশ টালিগঞ্জ এলাকা থেকে কতগুলো ছেলেকে ট্রাকে তুলে নিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে গৌতম বোসও আছে। শোনার পর দূর্বা আর তার মা সমস্ত রাত ঘুমোতে পারল না। খবর পেয়ে বাবা বেরিয়ে গেছল। তারা ভেবেছিল থানায় খোঁজ খবর নিতে গেল। তা না ঘণ্টা দুই বাদে বাবা টলতে টলতে ফিরল।

পরদিন সকালের কাগজে দেখা গেল, টালিগঞ্জের এক গোপন ঘাঁটিতে হানা দিতে গিয়ে পাঁচ ছ'টি ছেলের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ হয়, তাতে কয়েকজন পুলিশ অল্প-বিস্তর আহত হয়, আর সমাজ-বিরোধী ছেলে ক'টা মারা যায়। সকালের মধ্যেই পুলিশের লোক বাড়িতে এসেছে, বাবার সঙ্গে কথা বলেছে। বাবার সেদিন আপিসে যাওয়া হয়নি। তাকে হয়তো ছেলে সনাক্ত করার জন্য পুলিশের সঙ্গে যেতে হয়েছে। বেশি রাতে পুলিশের গাড়িতে দাদার দেহ কেওড়াতলায় এসেছে। তাদের সামনে দাদাকে দাহ করে বাবা সকালে ঘরে ফিরেছে।

দূর্বা বাবার চোখে জল দেখেনি। মায়ের চোখে না। নিজেও

কাঁদেনি, টুঁ-শব্দটি করেনি। একসময় অসহ্য লাগতে দাতুর কাছে ছুটে গেছল। দাতু ওর গায়ে পিঠে হাত বুলিয়েছে। কেউ কোনো কথা বলেনি।

বাবা তারপর আবার যে-কে সেই। মদ গিলে মারমুখি মেজাজ নিয়ে ঘরে ফেরে। পানের থেকে চুন খসলে চিৎকার চেঁচামেচি অকথ্য গালিগালাজ মারধর। দাদা নেই। দূর্বা ধরে নিয়েছিল এর থেকে জীবনে আর অব্যাহতি নেই।

বছর সতের বয়েস হতে মা আর দূর্বার গায়ে হাত তুলত না। ততদিনে ও হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছে। মা তখন তাকে অনেক কথা বলত যা আগে কখনো বলেনি।...মদের নেশা বাবার বিয়ের আগেই ছিল। চাকরিতে কিছু কিছু উন্নতি হবার আগে রেস আর জুয়ার নেশায় পেয়ে বসেছিল। বাবা তখন থেকেই মা-কে সন্দেহ করত। পাড়ায় কারো বাড়ি বেড়াতে গেলে বা কচিৎ কখনো কারো সঙ্গে সিনেমা-টিনেমায় গেলে বাবা তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতো। আর তখন মদের ঝোঁকে থাকলে মেরেও বসত। মদ খাওয়া আর রেস জুয়া যত বেড়েছে, সন্দেহও ততো বেড়েছে। সকালে মোটামুটি ভালো মানুষ, রাতে নেশা করে ফিরলেই সন্দেহ রোগ। সেটা আরো বেড়ে গেল শেফালি আসার পর। ডাক্তারকে অনুনয় বিনয় করে মা অপারেশন করে দিতে বলেছিল। আর যাতে ছেলে-পুলে না হয়। এমনিতেই চোখে অন্ধকার দেখে, এর পরেও খাওয়ার মুখ বাড়লে উপায় কি হবে। ফর্ম সই করিয়ে নিয়ে শেফালি হবার সময় ডাক্তার অপারেশন করে দিয়েছিল। বাবা সেটা অনেক পরে জানতে পেরেছিল। তারপর থেকে নেশা চড়লেই বাবার ওই সন্দেহ, মা তার নিজেব সুবিধের জন্যেই ওই কাজ করেছে। মাসের গোড়াতে মায়ের হাতে যা দেয় তাতে চলা যে কঠিন এই জ্ঞানও টনটনে। বেশি দেবে কোত্থেকে, এক পশলা ধার তো আপিসেই শোধ করে আসতে হয়। তার ওপর বাইরের ধার আছে, নেশার জন্য টাকা মজুত রাখা

আছে। কিন্তু মায়ের চলে কি করে? কোথাও এক পয়সা ধার না রেখে গোটা মাসটা মা চালিয়ে দেয় কি করে?

আসলে মামারা যে গোপনে কিছু কিছু দেয় সে খবর বাবা জানত না। ততো দিনে তারা খুব ভালোই জেনে গেছে বোন তাদের কি মানুষের খপ্পরে পড়েছে। মামারা যা দিত তা অবশ্য বেশি কিছুই না। এক একটা মাস কাটাতে মা-কে হিমসিম খেতে হতো। তা-ও মামারা সব মাসে সাহায্য করত এমন নয়। মা-ও মুখ ফুটে চাইত না। কিন্তু এই সাহায্যের কথা বাবা জানতে পেলে পেয়ে বসবে, মাসের ববাদ্দ আরো কমিয়ে দেবে। ফলে বাবার কুৎসিত সন্দেহ আর গালাগালও মা-কে মুখ বুজে হজম করতে হতো।

···মা এই ঘর ছেড়েছে, বাবাকে ছেড়েছে, আর ওদেরও দু'বোনকে ছেড়ে চলে গেছে পাঁচ বছর আগে। চলে যাবে যে দূর্বা জানত। সে একলাই শুধু জানত। মা তার আগে ওর সঙ্গে কথা বলেছে, পরামর্শ করেছে। শুধু কোথায় যাবে সেটা ওকেও বলেনি।

যেতে হয়েছে কারণ বাবার বিকৃতি তখন এত নিচু স্তরে নেমে গেছে যে মায়ের চলে যাওয়া ছাড়া আর গতি ছিল না। বাবা তখন সন্ধ্যার পর তাব দু'জন শাঁসালো বন্ধুকে বাড়িতে এনে ঘরে বসেই মদ খেত। এক-এক দিন এক-একজনকে আনত। একসঙ্গে দু'জনকে নয়। দূর্বা তখন দাদুর কাছে পড়তে চলে আসত। দাদু পড়াক বা না পড়াক, আরো দু'তিন বছর আগে থেকেই দাদুর ঘর দূর্বার পড়ার ঘর।

দূর্বার বয়েস তখন আঠেরো। কলেজে পড়ছে। অনেক জানে, অনেক বোঝে, অনুমান করতে পারে। মায়ের বয়েস উনচল্লিশ। কিন্তু বাবার এত অত্যাচার নির্যাতনেও শরীরের বাঁধুনি তার অদ্ভুত। বয়েস আরো পাঁচ ছ' বছর কম মনে হয়। দু'জনে একসঙ্গে রাস্তায় চললে কেউ মা-মেয়ে ভাবে না। এই মায়ের একমাত্র আশা ছিল, বড় মেয়ে পড়াশুনা করে দাঁড়িয়ে গেলে তবে যদি একটু সুখের মুখ

দেখতে পায়। তাই সন্ধ্যা পেরুলে মা-ই দূর্বাকে পড়াশুনার জন্য দাছুর কাছে তাড়া দিয়ে পাঠাতো। কিন্তু আশ্চর্য, এই মা-ই মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর ওকে ঘরে আটকে রাখতে লাগল। বলত, যেতে হবে না, ঘরেই পড়। আরো আশ্চর্য, বাবা সে-সময় ওকে ঘরে বসে পড়তে দেখলে ক্ষেপেই যেত। হাত ধরে এক-একদিন হিড়হিড় করে টেনে দরজার বাইরে ঠেলে দিয়েছে, বলেছে, পড়তে যা, ছু'ঘণ্টার আগে নেমে এলে আস্ত রাখব না।

পাশের ঘরে বাবার গেলাসের অতিথি। যে ছু'জন ইদানীং আসছে, ছু'জনেরই গাড়ি আছে। যে যেদিন আসে, তার গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। মা-কে এটা সেটা রেঁধে নিজের হাতে ও-ঘরে পৌঁছে দিতে হয়। বসে গল্পও করতে হয়। নইলে মানী অতিথির মর্যাদা হানি হয়। এরা ছুজনেই বাবার নাকি অনেক উপকার করেছে। করছে। উদার হয়ে আর বাবাকে ভালবেসে তার অনেক দেনা পর্যন্ত নাকি শুধে দিয়েছে।

ব্যাপারটা কোন্ দিকে গড়াতে চলেছে, মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দূর্বা সেটা বুঝতে পারে। মায়ের সারাক্ষণ থমথমে মুখ। কেবল বন্ধু নিয়ে সন্ধ্যার পর বাবা এলে হাসে, তৎপর হয়। যেদিন এর ব্যতিক্রম হয়েছে, বেশি রাতে বাবার হুমকি আর তর্জন গর্জন শোনা গেছে, মারের শব্দও কানে এসেছে।

এর মধ্যে দূর্বা একটা ছোট গল্প পড়েছিল। লেখকের নাম মনে নেই। অবাঙালী এক পুরুষের ছুই স্ত্রী ছিল। লোকটা যেমন ষণ্ডামার্কা, তেমনি রাগী আর তেমনি মাতাল। ছুই সতীনে একটুও বনিবনা ছিল না। তাদেরও ঝগড়াঝাঁটি খেও-খেয়ি লেগেই ছিল। মাতাল অবস্থায় ঘরে ফিরে তাদের মরদ ছু'জনকেই বেধড়ক পিটত। মেরে এক-একদিন মাটিতে শুইয়ে ফেলত। তারপর খেয়ে দেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতো। সেই ঘুম সকালের আগে ভাঙত না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমনি চলে। স্বামী তাদের

কাছে যম। দুই সতীনের মাথায় বুদ্ধি খেলল একদিন। স্বামীর অত্যাচার দু'জনকে কাছাকাছি এনে দিল। এত মার আর এত গঞ্জনা দুজনেরই অসহ্য হয়ে উঠেছে। দু'জনে বসে খুব সংগোপনে শলা-পরামর্শ করল কিছু। সন্ধ্যার পর স্বামী মদে চুর হয়ে ঘরে ফিরল। বউ দুটোর ত্রুটি খুঁজে বার করতে হয় না, মুখের দিকে তাকালেই ত্রুটি। সেদিন খেতে দিতে একটু দেরি হলো বলে দু'জনেরই অদৃষ্টে মারটা একটু বেশি জুটল। তারপর স্বামী তার খাটিয়ায় শুয়ে কুম্ভকর্ণের ঘুম। ঠেলে খাটিয়া থেকে ফেলে দিলেও সকালের আগে এ-ঘুম ভাঙবে না।

গা-ঝাড়া দিয়ে প্রস্তুত হয়ে তখন দুই সতীন ঘরে এলো। তাদের দু'জনেরই হাতে শক্তপোক্ত অনেকটা করে কর্ডের দড়ি। খুব নিঃশব্দে সেই দড়ি দিয়ে দু'দিক থেকে দু'জনে স্বামীকে বেশ করে খাটিয়ার সঙ্গে বাঁধতে লাগল। পা হাঁটু উরু কোমর পেট বুক দু'টো হাত— এক কথায় পা থেকে গলার নিচ পর্যন্ত খাটিয়ার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে গেল। তখন পর্যন্ত লোকটা ভালো করে টের পেল না। কেবল ঘুমের মধ্যে কোথায় যেন সামান্য একটু অসুবিধে হচ্ছে।

বাঁধার কাজ খুব ভালো করে শেষ করে এক সতীন একটা গামছা নিয়ে এলো। নেশার ঝোঁকে বেশ একটু হাঁ করেই ঘুমোয় তাদের মরদ। অল্প অল্প করে সে সেই গামছার আর্ধেকটার বেশি তার মুখে গুঁজে দিল পুঁটলির মতো করে। তখনো ঘুমের মধ্যে অসুবিধে আর একটু বাড়ছে শুধু, মুখ বন্ধ, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ চলছে। অন্য সতীন ততক্ষণে মরদেরই শক্তপোক্ত অনেক তেল-খাওয়া ডাণ্ডা দুটো নিয়ে প্রস্তুত। একটা নিজে রেখে অন্যটা সতীনের হাতে দিল।

তারপর শুরু হলো মার। সে কি মার কি মার! একেবারে যাকে বলে প্রাণের সাধে আশ মিটিয়ে মার। এতকাল ধরে ওই নির্মম মরদের হাতে যে মার খেয়েছে তার সবটা এক রাতের মধ্যে

উশুস করল তারা। কেবল পেট আর বুকের ওপর দিকে এগোলো না। পা থেকে কোমরের হাড় পর্যন্ত গুঁড়িয়ে দিল। মরদ মার খাচ্ছে আর দেখছে। মুখে গামছা গোঁজা। সর্বাঙ্গ খাটিয়ার সঙ্গে বাঁধা। গলা দিয়ে গোঁ-গোঁ একটা আওয়াজ বার করছে, আর চোখ দুটো যন্ত্রণায় ঠেলে বেরিয়ে আসছে। সেই রাম পিটুনির চোটে আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে—অর্থাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল।

দুই সতীন থামল এবার। তারপর যে যার ঘরে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ল।

পরদিন পড়শীরা এসে সব দেখল। সব বুঝলও। মরদকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। হাসপাতাল থেকে সে ছ'মাস বাদে ফিরল।

এখন সে সাত বেঁকা হয়ে অষ্টাবক্র মুনির মতো পথ চলে। ছোট্ ছেলেরা তাকে দেখে হাততালি দেয়।

পড়ার পর দূর্বার মনে হয়েছিল এমন গল্প আর জীবনে পড়েনি। গল্পটা জোর করে মা-কেও পড়িয়েছিল। ওর সাহসের অভাব নেই, কিন্তু মায়ের অত সাহস হবে না জানত।

দিন কয়েকের মধ্যেই মা ওকে বলল, এখান থেকে চলে যেতে হবে, নইলে আত্মহত্যা করতে হবে। রাতের সেই অতিথিদের খুশি করার হুকুম হয়েছে। অপারেশন যখন হয়ে গেছে, ভয়ের কি আছে। অসহায় মায়ের মুখে এ কথাও শুনতে হয়েছে দূর্বার।

তলায় তলায় মা অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিল জানত না। তার সঙ্গে কাছাকাছি মেয়েদের একটা বড় হাসপাতালের বড়-মায়ের খুব খাতির হয়ে গেছল। বড়-মা বলতে সেবায়তনের এক সন্ন্যাসিনী। দূর্বারা সকলে সেই হাসপাতালেই জন্মেছে। বড়-মা মা-কে বেশ স্নেহ করতেন। ঘরের খবর জানতেন বলেই মায়ের ওপর তাঁর করুণা ছিল। বছর কতক হলো তিনি আর এ হাসপাতালে নেই। বাইরে দূরে কোথায় চলে গেছেন শুনেছে। ওই সেবাপ্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা ভারতের প্রায় সর্বত্র।

…মা তলায় তলায় খোঁজ করে তাঁর ঠিকানা যোগাড় করেছিল। তাঁকে চিঠি লিখে সমস্যার কথা জানিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল। তিনি পত্রপাঠ চলে আসতে লিখেছেন।

দূর্বাকে মা সে-চিঠি দেখায়নি। কোথায়, কত দূরে যাচ্ছে তাও বলেনি। কারণ বাবা তাহলে মারের চোটেই সব বার করে নেবে। দূর্বাও জানার জন্য পীড়াপীড়ি করেনি। সে চেয়েছে মা চলে যাক। মা-কে আশ্বস্ত করেছে, দাদু আছে, দাদু আমাদের ঠিক দেখবে। আর জোর দিয়ে বলেছে, তুমি চলে গেলে বাবার অত্যাচার আমি বন্ধ করতে পারব জেনে রেখো। দাদা পেরেছিল। আমিও যেভাবে হোক পারবই। তুমি দেখে নিও। কিন্তু তুমি চলে না গেলে কিছুই পারব না।

কি করবে, কেমন করে করবে কিছুই জানে না। কিন্তু ভিতর থেকে জোর ঠিকই পেয়েছে। আর ভেবেছে, মা জীবনে কখনো শান্তি পায়নি। দূরে সরে গিয়ে একটু শান্তি পাক।

পরদিন সকালে বাবা খেয়ে দেয়ে আপিসে গেল। ওদের খাইয়ে নিজে খেয়ে মা-ও নিঃশব্দে চলে গেল। শেফালি পর্যন্ত কিছু জানল না। তার বয়েস মাত্র বারো তখন। রিকশয় ট্রাংক চাপিয়ে মা-কে কোথাও যেতে দেখলে হাজার প্রশ্ন করবে, নিজে যাবার বায়না তুলবে। আর বাবাও পরে জানবে ওদের দেখিয়েই মা কোথাও চলে গেছে। তাই খেয়ে দেয়ে সে যেমন স্কুলে যায়, তেমনি গেল। ঘুণাক্ষরে জানতেও পারল না ফিরে এসে মা-কে দেখবে না।

রিকশয় মায়ের ছোট ট্রাংক আর পুঁটলির মতো একটা বিছানা তুলে দেওয়া হলো। তার আগে রিকশর পর্দা ফেলে দেওয়া হয়েছে। তারপর চুপিসারে মা-কে নিয়ে দূর্বা রিকশয় উঠেছে। তখন দুপুর। কেউ কিছু লক্ষ্যও করল না। অনেকটা পথ পেরিয়ে নিরাপদ জায়গায় এসে দূর্বা রিকশ থেকে মা-কে নিয়ে নামল। তারপর তাকে হাওড়ার বাসে তুলে দিল।

নিজে সে সেখান থেকে কলেজে চলে গেল। অত্যাচারে মানুষের ভিতরটা কত পাথর হয়ে যায় মা-কে দেখেই বুঝেছে। মা-কে এতটুকু বিচলিত হতে দেখেনি, বা যাবার আগে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে দেখেনি। মা যেন ওকে আর শেফালিকে ঈশ্বরের পায়ে সঁপে দিয়ে অটুট সংকল্পে বুক বেঁধে ঘর-ছাড়া হয়ে গেল।

কলেজ থেকে একটু সকাল সকালেই ফিরল। ঘরের চাবি তার কাছে। শেফালি ফেরার আগে বাড়ির দরজার তালা খুলতে হবে।

স্কুল থেকে ফিরে ঘরে মা-কে না দেখে শেফালি সতের বার করে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, মা কোথায়? দূর্বারও এক জবাব, জানে না। সে-ও কলেজ থেকে ফিরে দেখেছে মা ঘরে নেই। সন্ধ্যার পর বড়লোক গেলাসের বন্ধুকে সঙ্গে করে বাবা এসেছে। মা-কে এদিক ওদিক কোথাও না দেখে ভ্রূকুটি। বড় মেয়েকে জিগ্যেস করেছে কোথায় গেল। তার এক জবাব, কলেজ থেকে ফিরে দেখে মা ঘরে নেই। বাবার সেই মুখ দেখে মনে হয়েছে পেলে মা-কে আস্ত চিবিয়ে খেত। চিবিয়ে খাবার জন্য তৈরিও ছিল। কারণ বাবার ধারণা, বন্ধু বিদেয় হবার পরে মা ঘরে ফিরবেই।

সেই রাতে আর কিছু গণ্ডগোল হলো না। কারণ রাগের চোটে নেশার মাত্রা খুব বেশি হবার ফলে বন্ধু বিদেয় হতেই বাবা ঘুমিয়ে পড়ল। খেলও না। পরদিন সকালে মা আর রাতে ফেরেইনি শুনে মাথায় খুন চাপল। মায়ের তোরঙ্গও নেই তা-ও চোখে পড়েছে। কিছুদিন আগে দূর্বাদের বড় মামা মারা গেছে। ছোট মামা আছে। সেখানে আছে ধবে নিয়ে আপিস কামাই করে ছোট মামার বাড়ি চলে গেল।

সেখানকার বৃত্তান্ত দূর্বা পরে জেনেছে। ছোট মামা বাবার বয়সী। মায়ের খবর কিছু জানে না শুনে বিশ্বাস করেনি। ষড়যন্ত্র করে মা-কে কোথাও পাঠানো হয়েছে ভেবে ছোট মামার সঙ্গে তুমুল হয়েছে। বাবা তাকে মারতে বাকি রেখেছে। তার ছেলেরা বাবাকে ঘাড় ধাক্কা

দিয়ে তাড়িয়েছে। বড় মামার বাড়িতেও গেছে। আরো কোথায় কোথায় খুঁজেছে দূর্বা জানে না। ঘরে ফিরেছে বিকেল চারটেয়। ভাত মুখে দিয়ে আবাব বেবিয়ে পড়েছে। সন্ধ্যায় ফিবেছে।

খুব আলতো কবে হঠাৎ দূবাকে জিগ্যেস কবেছে, কাল তুই কলেজ থেকে ফিবে দেখলি দবজা কপাট খোলা পডে আছে, আব মা নেই ?

এখানেই দূর্বা মস্ত ভুলটা কবে ফেলল। যদিও ভুলেব ফসল শেষ পর্যন্ত ভালোই হয়েছে। বাবাব প্রশ্নেব জবাবে দূর্বা যদি শুধু মাথা নেডে সায় দিত, ফুবিয়ে যেত। তাব কেবল মনে হলো মা অমন কাজ কবতে পাবে না। তাই জবাব দিল, কলেজ যাবাব আগে মা তাব হাতে একটা চাবি দিয়ে বলেছিল, তাব একটু বেকতে হবে, ফিবতে দেরি হতে পাবে।

—কোথায় যাবে তুই জিগ্যেস কবিস নি ?

দূর্বা মাথা খাটিয়ে জানালো, জিগ্যেস কবেছিল, মা শুধু বলল খুব দবকাবে এক জায়গায় যেতে হবে—।

বাবা চুপচাপ খানিক তাব মুখেব দিকে চেয়ে বইল। তারপব এগিয়ে এসে এমন একটা চড় বসালো গালে যে দূর্বাব পায়ের নিচে মাটি দুলতে লাগল, চোখে অন্ধকাব দেখল। সেই অবস্থাতেই বাবা তাকে চুলেব মুঠি ধরে টেনে এনে আব এক চড়ে মাটিতে বসিয়ে দিল। তাবপর আলনা থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে কুকুর বেড়ালেব মতো পিটতে লাগল। সেই সঙ্গে হুমকী আব গর্জন, বল্ শিগগীর কোথায় গেছে, নইলে আজ মেরেই ফেলব !

দূর্বা যতক্ষণ পেরেছে মাথা নেড়েছে। বলেছে জানে না। তারপর বুঝেছে বাবা সত্যি সত্যি মেরে ফেলবে। নিজেব কান্না আর আর্তনাদ যাতে বেরিয়ে না আসে তার জন্যে মুখে শাড়ির আঁচলের অনেকটা গুঁজে দিয়ে নির্জীবের মতো মার খেয়েছে। শেফালি একবার ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, বাবার বাঁ হাতের একটা চড় খেয়ে সে-ও তিন হাত দূরে ছিটকে পড়েছে।

যতটা মারলে পেটের কথা গলগল করে বেরিয়ে আসবে ভেবেছিল বাবা ততটাই মারল। তার পরেও কথা বেরুলো না দেখে হয়তো ধরে নিল সত্যিই জানে না। কিন্তু তার পরেও অনুতাপ নেই। মায়ের শাস্তি তার আদরের মেয়ে পাবে না তো কে পাবে ?

লাঠি ফেলে দিয়ে বাবা মদ নিয়ে বসল।

প্রায় এক-ঘণ্টা নিস্তেজের মতোই মাটিতে পড়ে থাকল দূর্বা। তারপর উঠল। এক গেলাস জল গড়িয়ে খেল। তের বছরের শেফালি তখন দিদিকে দেখছে। এত মার দিদি এমন মুখ বুজে সহ্য করল কি করে তার কাছে এটাই অবাক ব্যাপার।

দূর্বা শাড়ির আঁচল জড়িয়ে চুপচাপ বেরিয়ে এলো। পাশের বাড়ির দোতলায় উঠে সোজা দাদুর ঘরে।

রাধাকান্ত তাঁর অংকের বইয়ে নতুন কি বাড়াবেন কাগজ কলম নিয়ে বসে তার খসড়া করছিলেন। ডাকলেন, আয়, তোর বাবার তর্জন গর্জন শুনছিলাম, তোর মা-টা আজ আবার ভর সন্ধ্যেতেই মার খেল বুঝি ?

দূর্বা কাছে এসে দাঁড়াল।—না, আমি।

চকিতে মুখ তুলে তাকালেন রাধাকান্ত। ফর্সা দুই গালে ঘন আঙুলের ছাপ। দূর্বার দু'চোখ জ্বলছে। ঘুরে দাঁড়াল। শাড়ির আঁচল সরিয়ে ব্লাউজের পিছনটা ঘাড় পর্যন্ত তুলে ফেলল। সেই দাগড়া দাগড়া চামড়া-ফাটা মারের দাগ দেখে রাধাকান্ত অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। ব্লাউজ নামিয়ে দূর্বা ঘুরে দাঁড়ালো। সে-ও তখন কাণ্ডজ্ঞান শূন্য। শাড়ির নিচের দিকটা হাঁটুর ওপর তুলে ফেলল। সেখানেও ওই রকম দাগের সারি। শাড়ি নামিয়ে হিসহিস করে বলল, আরো আছে, দেখাতে পারছি না।

ব্যাকুল আবেগে ওকে দু'হাতে কাছে টেনে আনতে চাইলেন রাধাকান্ত, কেন ? কি হয়েছে ? পাষণ্ডটা এ-রকম করে মারল কেন তোকে ?

দাছুর ছু'হাত ঠেলে দিল দূর্বা। দাঁড়িয়েই রইল। জবাব দিল, মা কাল ছুপুরে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। না গেলে তাকে বাবার ছুই বন্ধুর হাতে পড়তে হতো। তারা বাবার দেনা শুধছে। মা বাংলা-দেশের বাইরে কোথাও চলে গেছে—কোথায় গেছে জানি না, কাদের আশ্রমে গেছে জানি। আমার মুখ থেকে কথা বার করার জন্য এ-রকম করে মেরেছে—আমি যেটুকু জানি তা-ও বলিনি। তুমিও খবরদার কাউকে বলবে না—কাউকে না। আশ্রম শুনলেই বাবা ঠিক বার করে নেবে।···এখন তুমি কিছু করতে পারবে কিনা বলো, না যদি পারো আমিও আর ওখানে থাকব না, যেখানে খুশি যার সঙ্গে খুশি চলে যাব!

রাধাকান্ত এবারে জোর করেই ওকে কাছে টেনে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। অনেকক্ষণ বাদে বললেন, কিছু করতে যদি না পারি তোর দাছু মরে গেছে ধরে নিস।

একটু বাদে উঠলেন। কাঠের হোমিওপ্যাথী বাক্সটা নিয়ে এলেন। অবসর সময় এ চর্চাও করেন। দূর্বা এবারে তাঁর দেওয়া ওষুধ খেতে আপত্তি করল না। আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রাধাকান্ত বললেন, তোর মা কোনো আশ্রমে টাশ্রমে চলে গেছে এ-ও যদি না বলি তাহলে তো যা-তা কথা উঠবে, পাড়ার লোকের মুখ তো জানিস···।

দূর্বা ঝলসে উঠল।—যে যা খুশি বলুক, তুমি কিচ্ছু বলবে না! যা-খুশি রটাক, কি যায় আসে?

—ঠিক আছে। তোর বাবা এখন কি করছে?

—মদ নিয়ে বসেছে।

—সকালে ঘুম থেকে ওঠে ক'টায়?

—সাতটার আগে না।

—আপিসে বেরোয় ক'টায়?

—সাড়ে ন'টায়।

পরদিন কি হবে বা কি দেখবে দূর্বারও ধারণা ছিল না।

রাধাকান্ত ঘুম থেকে ওঠেন রাত চারটেয়। এই বয়সেও গাঢ় ঘুম হয়। কিন্তু রাতটা প্রায় ছটফট করে কাটল। চা-টা খেয়ে সকাল ছ'টার মধ্যে তিনি বেড়িয়ে ফেরেন। সেদিনও তাই ফিরলেন। কিন্তু নিজের বাড়িতে ঢুকলেন না। পাড়ার লোকের বাড়ি বাড়ি ঢুঁ দিয়ে বেড়ালেন। পাড়ার সকলেরই সম্মান আর খাতিরের মানুষ তিনি।

কৃষ্ণেন্দ্র বোস একটা ওষুধই ভালো চেনে এটুকু রাধাকান্তের জানা ছিল। সতের বছরের ছেলে গৌতম কিছু দিনের জন্যে হলেও তার বাবাকে কি-রকম টিট করেছিল পরে দূর্বার মুখে শুনেছেন। এদিক থেকে পাড়ার হাওয়া অনুকূল। দু'বছর আগে এখানেও আবার পাকাপোক্ত কংগ্রেস রাজত্ব কায়েম হয়েছে। দু'শ আশীটার মধ্যে দু'শ ষোলটা সিট দখল করে সিদ্ধার্থশংকর মুখ্যমন্ত্রীর আসনে জাঁকিয়ে বসে আছেন। এ-রাজ্যে কংগ্রেসের এতবড় জয়ের নজির নেই। ফলে সর্বত্র তাদের হোমরাচোমরাদের ঘাঁটি। আর সেখানে নানা বয়সের সাগরেদদের ভিড় আর জটলা। নেতাদের জোরে তারা ধরাকে সরা দেখে। চোখের ওপর তাদের জুলুম দেখলেও পুলিশ বেশির ভাগ সময় চোখ বুজে থাকে।

আশপাশের অনেক বাড়ির কর্তাদের জুটিয়ে রাধাকান্ত এই এলাকার তরুণ এম-এল-এ'র সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর সাগরেদরাও সেখানে উপস্থিত। আর রাধাকান্তকে না জানে কে, না চেনে কে। দাদু তাদের যতটুকু বলার বললেন। কি চান জানালেন। প্রৌঢ় আর প্রবীণরা তাঁর প্রস্তাবে এক বাক্যে সায় দিলেন। তরুণ নেতা কথা দিল, সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে ফয়সলা হয়ে যাবে।

সাড়ে আটটা নয়, ঠিক ন'টা তখন। দূর্বাদের দরজা সর্বদা বন্ধ থাকে। দুমদাম ধাক্কা পড়ল। বাইরে চাপা কলরবও শোনা গেল। দরজা খুলেই দূর্বা দেখে নানা বয়সের পঞ্চাশ ষাটজন ছেলে দাঁড়িয়ে।

কি ব্যাপার না বুঝে কৃষ্ণেন্দুরও ভেবাচাকা মুখ। সে-ই এগিয়ে এসে জিগ্যেস করল, কি চাই ?

জনা দুই বলল, আপনাকে। বেরিয়ে আসুন—

অজানা আতঙ্কে মুখ শুকালো কৃষ্ণেন্দুর।—আমার তো এখন আপিস আছে !

সঙ্গে সঙ্গে দু'তিন জন একসঙ্গে তার জামাব বুকেব কাছটা খামছে ধরল, একজন পালিশ কবা চুলেব মুঠিও। হিড়হিড় করে তাকে বাইবে টেনে এনে তাবা বলল, তুমি আপিস যাবে কি যমের বাড়ি যাবে সেটা এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবে—

ধাক্কা মেরে মেবে তাবা তাকে পাশেব বাড়িতে তুলছে দেখে কৃষ্ণেন্দু বোস আতঙ্ক সত্ত্বেও অবাক। কিন্তু অনেকগুলো ছেলের তাতেও আপত্তি। বলে উঠল, আগে ওকে একটু পালিশ করে নিয়ে ওপরে পৌঁছে দেওয়া যাক না—

কিন্তু অপেক্ষাকৃত মাথা-ঠাণ্ডা ছেলেবা এ-প্রস্তাবে সায় দিল না। দাছু অনুবোধ করেছিল, কোনবকম বিশৃঙ্খলা বা হামলা যেন না হয়। নেতাবও তাই নির্দেশ। অতএব ধাক্কা মেরে মেবে দাছুর বাড়ির দোতলায় এনে তোলা হলো তাকে।

এখানে এসেও দু'চক্ষু স্থিব কৃষ্ণেন্দু বোসের। বড় ঘরে বসে আছে আশপাশের প্রায় সব ক'টা বাড়ির প্রৌঢ় বা প্রবীণ কর্তারা। কম করে বিশ বাইশজন হবে। ছেলের দঙ্গল ধাক্কা মেরে কৃষ্ণেন্দু বোসকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দিল। তাদের ওপর হুকুম ছিল তারা যেন বাইরে অপেক্ষা করে, কেউ না ঘবে ঢোকে। তারা সেই হুকুম পালন করল বটে, কিন্তু বিচার দেখার লোভ সামলে নিচে নেমে আসতে পারল না—বারান্দা আর দরজার কাছেই হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে বইল।

যে হামলার ব্যাপারে রাধাকান্তর এত সতর্কতা, কৃষ্ণেন্দু বোসকে দেখামাত্র তিনিই পাগলের মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন। তক্ষুণি দূর্বার সমস্ত গায়ের সেই নৃশংস মারের চিহ্নগুলো মনে

পড়েছে। গালাগাল দিয়ে বেড়ানোর লাঠিটা তুলে নিয়ে ওকেও আগে একপ্রস্থ কুকুর বেড়ালের মতো মেরে নেওয়ার আক্রোশ। বুড়োর এমন রাগ আর কেউ কখনো দেখেনি। প্রবীণেরা তিন চারজনে মিলে তাঁকে আগলে রাখলেন। আর তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, ছাড়ো—ছাড়ো বলছি—মেয়েটাকে কি মার মেরেছে তোমরা ভাবতে পারবে না—আমার জেল হোক, ফাঁসী হোক আমি ওকে খুন করব—ছাড়ো!

রাগে থরথর করে কাঁপছেন। বেশ চেষ্টা করে হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে তাঁকে আবার বসানো হলো। কৃষ্ণেন্দুর সমস্ত মুখ ভয়ে বিবর্ণ। দরজার বাইরে ছেলের দঙ্গলটা দেখছে। কোন্ অপরাধে তাকে এ-ভাবে এখানে টেনে আনা হয়েছে তাও বুঝেছে। রাধাকান্ত তখনো ফুঁসছেন, গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পারিস না জানোয়ার কোথাকারের, তোর মেয়ের ওই মার দেখিয়ে তোকে আমি জেল খাটাতে পারি কিনা দেখতে চাস রাসকেল কোথাকার?

কৃষ্ণেন্দু বোস কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে।

খানিক দম নিয়ে তিনি আবার গর্জে উঠলেন, আর কখনো ওই মেয়ে দুটোর গায়ে হাত উঠবে?

কৃষ্ণেন্দু বোস মাথা নাড়ল, উঠবে না।

রাধাকান্ত উঠে এগিয়ে দরজার কাছে এলেন। ছেলের দঙ্গলকে বললেন, তোমরা ভাইয়েরা (সকলেরই দাছু তিনি, সেই সম্পর্কে ভাই) নিচে গিয়ে দাঁড়াও। দরকার হলে তোমাদের ডাকব।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা নিচে নেমে গেল। আধা সিঁড়িতে কেউ কেউ দাঁড়িয়েও রইল। রাধাকান্ত দরজা দুটো বন্ধ করলেন। তারপর কৃষ্ণেন্দুর কাছে এসে বজ্রগম্ভীর আদেশ দিলেন, নাকে-খত দাও!

কৃষ্ণেন্দু মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই রইল। দু'হাতে সজোরে তাকে একটা ধাক্কা মেরে রাধাকান্ত গর্জে উঠলেন, বোস! নাকে-খত দে! ওই মেয়ে দুটোর জন্যেই এবারের মতো তোকে আমি

প্রাণে বাঁচতে দিচ্ছি—দ্বিতীয় বার আর বলব না, দরজা খুলে ওই ছেলেদের হাতে তোকে ছেড়ে দেব !

কৃষ্ণেন্দু বোস মেঝেতে বসল। ঘামছে। নিচু হয়ে মেঝেতে নাক ছোঁয়ালো।

মুখ তুলতে রাধাকান্ত বললেন, তিনটি শর্তে এবারেব মতো আমরা তোমাকে নিষ্কৃতি দেব আর ক্ষমা কবব। এক, ওই মেয়ে দুটোর গায়ে হাত তুললে বা ওদেব সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছ আমাদের কানে এলে তোমাব দুটো হাত মুচড়ে ভেঙে দেওয়া হবে। মনে থাকবে ?

কৃষ্ণেন্দু বোস মাথা নাড়ল। থাকবে।

—দুই, ঘরে বসে মদ খেতে পাবে না, বা একটুও হল্লা করতে পাবে না। তুমি অপদার্থ, কিন্তু তোমাব মেয়েব মাথা কাটা যায়। মনে থাকবে ?

কৃষ্ণেন্দু বোস মাথা নাড়ল। থাকবে।

—তোমার স্ত্রীব হাতে সংসাব খবচেব জন্য মাসে কত টাকা দিতে ?

বিড়বিড় করে বলল কত দিত।

—মাসের কত তারিখে মাইনে পাও ?

তাও বলল।

—তৃতীয় শর্ত, প্রত্যেক মাসেব ওই তারিখে দূর্বার হাতে গুণে গুণে তুমি সেই টাকা তুলে দেবে। ওই টাকায় মাস চলার কথা নয়, চলে কিনা আমি খোঁজ নিয়ে দেখব—দরকার হলে আরো বেশি দিতে হবে। আপাতত ওই তারিখে অত টাকা তুমি তার হাতে দেবে। মনে থাকবে ?

কৃষ্ণেন্দু বোস মাথা নাড়ল। মনে থাকবে।

আঠারো বছরের মেয়ে কি কাণ্ড বাধিয়ে তুলতে পারে কৃষ্ণেন্দু

বোসের সেটা কল্পনার মধ্যেও ছিল না। ছেলেটার কথা ভোলেনি কিন্তু মেয়েটাকে আরো ভয়ংকর মনে হয়েছে তার। না, মুখে আর একটি কথাও বলেনি। মনে মনে রাধাকান্ত আচার্যকে এক নম্বর শত্রু ভাবে। দু' নম্বর বড় মেয়ে। ওই বুড়ো যখন তখন নাতনিদের খোঁজ নেবার জন্য হাসিমুখে অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে। আসলে শর্ত মানা হচ্ছে কিনা নিজের চোখে সেটা যাচাই করে যায়, এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি কৃষ্ণেন্দু বোসের আছে। অবশ্য আসাটা এখন কমে গেছে। কারণ কৃষ্ণেন্দু বোস শর্ত মেনে চলেছে। বড় মেয়ের সঙ্গে কথাই বলে না। বছর তিন চারের মধ্যে বাড়িতেও মদ খায় না। বাইরে থেকে খেয়ে এসেও হৈ-হল্লা করে না। মাসের শেষে শেফালির হাত দিয়ে বড় মেয়ের কাছে টাকাও দেয়।

এই একবছর হলো মাঝে মাঝে শর্তের খেলাপ করছে, দূর্বা সেটা দেখে যাচ্ছে। এক-একদিন আবার ঘরে বসে মদ খেতে শুরু করেছে। কিন্তু হৈ-হল্লা তেমন একটা করে না। ওকে শুনিয়েই বলে, কি কারণে ঘরে বসে একটু খেতে হচ্ছে। সঙ্গে তার ভক্ত চেলা অমল বিশ্বাসও থাকেই। সপ্তাহের মধ্যে তিন চার দিন অফিস ফেরৎ বাবার সঙ্গে সে এখানে আসে, সন্ধ্যায় তার সঙ্গেই বেরিয়ে যায়। নেশা করে ফিরতে ফিরতে বাবার রাত সাড়ে দশটা বেজে যায়।

ওই অমল বিশ্বাসকে দিনে দিনে অসহ্য হয়ে উঠছিল দূর্বা বোসের। তার লোভী চাউনি দেখলেও সর্বাঙ্গ ঘিনঘিন করে। বাবা ইদানীং প্রায়ই ওকে শুনিয়ে বাতাসে কথা ছোঁড়ে। অমলের মতো অমন ছেলে হয় না, আপিসেও কাজের সুনাম কত। একটা প্রমোশন পেয়েইছে, আরো ক'টা পাবে বা কত ওপরে চলে যাবে ঠিক নেই। মদও একটু আধটু তার পাল্লায় পড়েই খায়—কেউ মুখের কথা খসালে সেই মুহূর্তে ছেড়ে দেবে। লোকটারও সর্বদা এই প্রশ্রয়ের সুযোগ নেবার চেষ্টা। হেসে হেসে সামনে এসে দাঁড়ায়, ওরা দু'বোন যেন কত স্নেহের পাত্রী তার। ছুটির দিনে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতে

চায়, খাবার কিনে আনে। শেফালি ছোট, লোভীর মতো খায়, দূর্বা স্পর্শও করে না।

গত পাঁচ বছর ধরে আর এক দিক থেকেও নিঃশব্দে কম উৎপাত সহ্য করে চলছে না দূর্বা। কাছে পিঠের বয়েসকালের ছেলেগুলোর বেপরোয়া প্রণয়ের উৎপাত। মা ঘর ছেড়ে চলে গেছে কোথাও, সেটা জানাজানি হতে সময় লাগেনি। ওকে ডেকে কেউ কিছু জিগ্যেস করেনি। যে যেমন খুশি ভেবে নিয়েছে। বয়স্কারা গালে হাত দিয়ে তাজ্জব বনেছে, বাপ যত খারাপই হোক, ওই বয়সের মেয়ে দুটোকে ফেলে সে চলে যেতে পারল কি করে? ঘুরে ফিরে অনেকের সন্দেহ, বাবা অত্যাচার করত কেন তারই বা ঠিক কি—ওই রূপসীরও ভিতরে ভিতরে কি চরিত্র ছিল কে জানে!

দিন মাস গেছে, বছর ঘুরেছে একটা দুটো করে। তখন পর্যন্ত এ বাড়ির বউটা নিপাত্তা যখন, তার চরিত্র বুঝে নিতে আর বাকি নেই কারো। অমন মায়ের আর অমন মাতাল বাপের মেয়েকে কে আর কতটুকু সমীহ করবে? যারা রক্ষক হয়ে একদিন তাদের ঘরে এসে বাবাকে টেনে বার করে দাদুর কাছে ধরে নিয়ে গেছল, তাদের মধ্যে লায়েক ছেলেও কম নেই। তাদেরও আবার নিজস্ব ছোট-বড় দল আছে। সেই ব্যাপারের পর থেকেই রাস্তায় বা কলেজে বেরুলে ফাঁক মতো ভাব করার চেষ্টায় এগিয়ে এসেছে। বোবার শত্রু নেই। দূর্বা যতটা সম্ভব বোবা হয়েই থাকতে চেষ্টা করেছে। এই মেয়ে মাথা খেতে পারে ভেবে প্রতিবেশীদের অনেকেরই ছেলে আগলানোর চেষ্টা। কিন্তু ছেলেরাও এত বোকা নয় যে মায়ের আঁচলের তলায় বসে থাকবে বা গার্জেনদের চোখের সামনে প্রেম নিবেদন করতে আসবে। দূর্বা কোন্ কলেজে পড়ে মাস্তানদের বা আশপাশের প্রেমিকদের কে না জানে। দূরে গিয়ে কলেজের পথে সঙ্গ নেয়, বাসে চেপে সঙ্গে কলেজ পর্যন্তও আসে কেউ কেউ। ফিরতি পথেও একই ব্যাপার। হাতে চিঠি গুঁজে দেয়। আবার অবজ্ঞা করা হচ্ছে ভেবে তাদের

আঁতেও লাগে। কিন্তু একটা সুবিধে প্রেমিকের সংখ্যা এমন পাঁচ সাত জন আছে। ওকে নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে মারামারি বেধে যাওয়াও বিচিত্র নয়। যে দু'তিনটে ছেলে বেশি বেপরোয়া বা বেশি সেয়ানা, দূর্বাকে তাদের সঙ্গে একটু মানিয়ে চলতে হয়। হেসে দুই একটা কথা বলে, অল্প হেসে তাদের কথাও শোনে। নিরীহ মুখে জানান দেয়, ওমুক-দা ওমুক কথা বলেছিল। ওমুকদার ওপর সেই ছেলে খাপ্পা হয়। ওকে আশ্বাস দেয়, কিচ্ছু ঘাবড়াবার দরকার নেই, দরকার হলে খতম করে দেবে। ওমুক-দাকেও আবার সেই কথাই বলে, আর তারও একই রকম উষ্মা দেখে। এ-সবের কিছুই পাড়ার মানুষের চোখের ওপর নয়।

দায়ে পড়ে এক-আধজনের কাছে এমন আভাসও প্রকাশ করতে হয়েছে, ওর বি. এ. পাশ করা হয়ে গেলে আর প্রেমিকের চাকরি বাকরির ব্যবস্থা হলে তারপর না-হয় ভবিষ্যৎ চিন্তা করবে। কিন্তু এ-ও বোঝে প্রেম যারা করতে চায়, বিয়ে পর্যন্ত তাদের সকলের লক্ষ্য নয়। তাদের আপাত খিদেটাই বড়।

কলেজে পড়ার শেষের দিকে একমাত্র দাদুকেই ও এই উৎপাতের আভাস দিয়েছিল। দাদু শুনে যাচ্ছেতাই ঠাট্টা করেছে। বলেছে, তোকে দেখে এই বুড়ো বয়সে আমারই যা হয়, ওদের আর দোষ কি দেব বল্। কিন্তু করার যেটুকু চুপচাপ করেছে। এলাকার সেই কংগ্রেস এম. এল. এ. নেতার বাড়ি তার যাতায়াত বেড়েছে। তার সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আর দাদু ওকে কি চোখে দেখে তাই বা না জানে কে। তাই ভরসা করে অসম সাহসের ব্যাপার কেউ করে বসেনি। প্রণয়ের রাস্তা ধরে যতটা এগোনো যায় সেই চেষ্টা করেছে। ফলে কলেজের মেয়েরা ওকে যাচ্ছেতাই ঠাট্টা ঠিসারা করত। তারা জেনে বসে আছে, দূর্বা বোস একসঙ্গে গোটাকতক ছেলেকে বেশ খেলাচ্ছে।

বি. এ. পরীক্ষার পর কিছুটা স্বস্তি। দরকার খুব না হলে ঘর

থেকে বেরুতোই না। দোকানে বা বাজারে হামেশাই যেতে হয়। কিন্তু পাড়ার ছেলেরা অন্তত চোখে পড়ার মতো প্রণয় কাণ্ডের মহড়া দিতে আসে না। বড় জোব এক ফাঁকে কেউ সময় ধরে বিকেলেব দিকে লেকে-টেকে নিরিবিলি সাক্ষাৎকারের বাসনা জানায়। দূর্বার কিছু না কিছু দরকারি কাজ পড়েই যায়। সে যেতে চেষ্টা করবে বলেও গিয়ে উঠতে পারে না।

বি. এ পাশ করার পবেব বছবে এই উৎপাত অনেকটা কমল। গত দেড় দু'বছর বাজনীতির বাতাস আবাব নানা দিক থেকে সরগরম হয়ে উঠেছিল। শুধু দিল্লিতে নয়, এই বাংলায়ও কংগ্রেস শাসনেব আত্মপ্রসাদ আর নতুন নতুন আইন জারির ফাঁক দিয়ে একটা বিরুদ্ধ শক্তি প্রবল হয়ে উঠছিল। এর মধ্যে সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ খেপে খেপে পশ্চিম বাংলায় এসেছেন, সর্বত্র বিরুদ্ধ শক্তিব সঙ্গে হাত মিলিয়ে এক সামগ্রিক বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে কায়েমী শাসনের অবসানের দিকে এগনোর সংকল্প তাঁর। জেপির লক্ষ্য পীড়িত সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন। তাঁর ইচ্ছের বেগ সাধারণ মানুষের বুকের তলায় পৌঁছেছে। সর্বত্র দাবি, মিসা তুলে দাও, ডি. আই. আর তুলে দাও—মানুষের নাগরিক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দাও। এর জবাবে এলো 'ইমারজেন্সি'—আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কারণে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা। অসুস্থ জয়প্রকাশসহ ভারতের বাছাই করা বিরুদ্ধচারী নেতাদের ছেঁকে নিয়ে জেলে পোরা হলো। পরের বছরে এর ওপর নতুন অর্ডনান্সে মিসা'র কড়াকড়ি আরো বেড়ে গেল। কারণ না দেখিয়ে সরকারের যে-কোনো লোককে চব্বিশ মাস পর্যন্ত আটক করে রাখার ক্ষমতা। কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষা হলো না। পরের বছরের সাধারণ নির্বাচনে দেশের মানুষ কংগ্রেস দলকে শাসনের মসনদ থেকে টেনে নামালো। কিছু দিনের মধ্যে রাজ্যে রাজ্যেও ওলট-পালট। পশ্চিম বাংলায় বামপন্থী শাসন ফিরে এলো।

দূর্বা বোস কখনো রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না বা ঘামায়নি। কিন্তু আশপাশের ছেলে ছোকরাদের আচরণের রকমফের অনুভব করেছে। কিছুদিন আগেও যারা বুক ফুলিয়ে রাস্তায় চলেছে তারা সাপের মাথায় ধূলো-পড়া গোছের ম্রিয়মাণ। দাহু ওরই মুখ চেয়ে এই ফাঁকে আবার স্থানীয় বাম-পাণ্ডাদের সঙ্গেও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। এই দলের ছেলেরাও রক্ষকের ভূমিকা থেকে কবে আবার ভক্ষক হয়ে উঠতে চাইবে দূর্বা জানে না। কিন্তু আপাতত সুস্থির একটু। আগের কাউকে পাত্তা না দিলেও তাদের ভ্রূকুটি তেমন ঘোরালো হয়ে ওঠে না

ব্যতিক্রম একজন। বসন্ত রায়। এই রাস্তাটার দক্ষিণে শেষের প্রান্তে তাদেব বাড়ি। অনেকের ধারণা এই বসন্ত রায় দূর্বা বোসের খপ্পরে পড়েছে। অবস্থাপন্ন। বাপ অ্যাডভোকেট। তাঁর এই এক ছেলের পর তিন মেয়ে। ফলে একটু বেশি আদরের। কিন্তু ছেলেটা ভদ্র, বছর কয়েক আগে বি. এ. পাশ করে কাব্য চর্চা করছে, গল্প লেখায় হাত মক্স করছে। বয়েস সাতাশ আঠাশ। বাপের ইচ্ছে ছিল ল' পাশ করে ছেলে তাঁর পেশায় আসুক। কিন্তু অমন গড্ডাকারের জীবন বসন্ত রায়ের আদৌ পছন্দ নয়। এ দিকের ছেলেরা তাকে ঠিক পাড়ার ছেলে ভাবেনা। তাই এদিকে এলেই তাদের ঘাড় বেঁকে যায়, চোখ তেরছা হয়। কিন্তু সহ্য করতে হয়, কারণ সেই ছেলে দূর্বাদের বাড়ি আসে না, বা রাস্তায় অপেক্ষা করে তার সঙ্গে কথা বলারও ফাঁক খোঁজে না। আসে দাহুর বাড়ি। তারও উকিল-বাবা স্কুলে দাহুর ছাত্র ছিলেন। বসন্ত ছেলেবেলা থেকে মাস্টার দাহুর কাছে আসে। দূর্বা যখন স্কুলে একটু ওপরের ক্লাসে পড়ে আর ও-ছেলে কলেজে—তখন থেকেই দূর্বা তার মতি-গতি লক্ষ্য করে আসছে। আর ক্রমে সেটা এমনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে দাহুরও জানতে বুঝতে বাকি থাকেনি।

দাহু বসন্তকে এ-ব্যাপারে তেমন প্রশ্রয় দেয়নি, কিন্তু দূর্বাকে ঠাট্টা

ঠিসারায় জর্জরিত করে তোলে। কারণ বি. এ. পাশ করার পর থেকে দূর্বার সন্ধ্যার টিউশনি ওই বাড়িতে। বসন্ত রায় দাদুকে অনুরোধ করেছিল, তার ছোট বোনটাকে দূর্বা পড়াবে কি না। মাস গেলে টাকার এত টানাটানি যে দাদুর প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেছে। এই ছেলের জন্য আর যা-ই হোক ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। অ্যাডভোকেট গৃহিনীর মেয়ের জন্য এই বয়সের শিক্ষয়িত্রী রাখাটা খুব পছন্দ ছিল না। আর ছেলেব ইচ্ছেটাও সাদা চোখে দেখেননি। কিন্তু দাদুর সুপারিশ এই অ্যাডভোকেট ভদ্রলোকের কাছেও ভিন্ন ব্যাপার। তিনি খবর নিতে এসে প্রশংসার ফিরিস্তি শুনে চোখ-কান বুজে এই শিক্ষয়িত্রীই বহাল করেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি তিরিশ টাকা মাইনে ঠিক করেছিলেন। পরের বছর মেয়ে মোটামুটি ভালো পাশ করতে সেটা চল্লিশ টাকায় উঠেছে।

উকিল বাড়ির কর্তা-গিন্নি দূর্বাদের পারিবারিক খবর অত রাখতেন না। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁদেরও কানে উঠেছে। বসন্তর বাবা যত না, তার মা-টি কারণে-অকারণে সন্দিগ্ধ। অন্যদিকে আবার ভারী হিসেবী মহিলাটি। তার ছোট মেয়ের এই মাস্টার ভারী পছন্দ। সরাতে চাইলে চিৎকার চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় করবে। দ্বিতীয়, এই মাইনের ভাল টাকা গুণেও মেয়ের জন্য ভালো মাস্টার পাবেন কিনা সন্দেহ। তৃতীয়, ছেলেকে কি কারণ দেখাবেন? বাইরে যত নরম-সরমই হোক, বাড়িতে তো এই ছেলে নয়নের মণি। ছেলের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবেন? ওই মেয়ে যখন পড়াতে আসে, ছেলের তখন বার কয়েক অন্তত ওই ঘরে কাজ পড়ে সেটা লক্ষ্য করেছেন মহিলা। কিন্তু গত দু'বছরের মধ্যে কোনরকম বেচাল তো দেখেননি। ছেলে হয় কবিতা শোনাতে যায়, নয়তো সাহিত্য নিয়ে তার কিছু আলোচনার দরকার হয়ে পড়ে—তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু এ-ব্যাপার এমনি জিনিস যে অশান্তি বাড়ে ছাড়া কমে না। ছেলে আর দূর্বা বোসকে নিয়ে বেনামি একটা বিচ্ছিরি উড়ো চিঠি

পর্যন্ত মহিলার নামে ডাকে এসেছে। অমন চিঠি কোনো বাজে ছেলের কাণ্ড এই সহজ বুদ্ধিও তাঁর আছে। স্বামীকে সেই চিঠি দেখিয়েছেন—তাঁরও একই মন্তব্য। কিন্তু দু'জনেরই অস্বস্তি যাবে কোথায়।

এই ছেলেকে নিয়ে তাঁদের অনেক আশা, অনেক বাসনা। এমন কন্দর্পকান্তি ছেলে (চেহারা সত্যি সুন্দর) তাঁর, ছেঁকে বেছে বড় ঘরের কত রূপসী বউ আনবেন, আমোদ আহ্লাদ করবেন। এ আশায় ছাই পড়লে সেটা আদৌ বরদাস্ত হবে না। অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক বাইরে অন্তত রাশভারি মানুষ। ছেলেকে ডেকে সোজা বলে দিলেন, তাঁর মাস্টারমশায়ের (দাদুর) কাছে শুনেছেন মেয়েটি ভালো, তিনি অবিশ্বাসও করেন না—যদিও তার নাম করে কুৎসিত উড়ো চিঠি এসেছে—তবু ছেলে যেন এটুকু ভালো করে জেনে রাখে তাঁদের অমতে কোথাও বিয়ে থাওয়ার ব্যাপার ঘটিয়ে বসলে সেটা বরদাস্ত হবে না—এ-বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্কও থাকবে না। বাপের মুখের ওপর ছেলে কথা বলে না। মুখ আমসি করে চলে এসেছে। পরে ফাঁকমতো দূর্বাকে বাপের অবুঝপনার কথা বলে রাগে ফুঁসেছে। দূর্বা শুধু হেসেছে। কোনো মন্তব্য করেনি।

দিন যায়। বসন্ত রায়ের উদ্বেগ একটু কমেছে। কারণ বাবা-মা এত মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তাদের চাহিদা-মতো যোগাযোগ হয়ে উঠছে না। রূপ কিছু মেলে তো বড় ঘর মেলে না, আবার বড় ঘর মেলে তো রূপ মেলে না।

মাস দেড়েক আগের কথা। তার বোনকে পড়িয়ে রাস্তায় নেমে দূর্বা দেখে অদূরের আবছা অন্ধকারে কেউ দাঁড়িয়ে। ভালো করে লক্ষ্য করে বুঝল, বসন্ত। কি করবে ঠিক করতে না পেরে পায়ে পায়ে এগোতেই থাকল। বাড়ি দশ মিনিটের হাঁটা পথ।

বসন্ত কাছে এসে সঙ্গ নিল। আমতা আমতা করে বলল, ক'দিন ধরেই তোমাকে বলব-বলব ভাবছি···এরা যে-যাই বলুক, দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, এবারে আমাদের বিয়েটা হয়ে যাওয়া উচিত।

দূর্বা মুখ ঘুরিয়ে একবার তার দিকে তাকালো শুধু। জবাব দিল না।

বসন্ত রায় আরো উদ্‌গ্রীব।—কি বলো ? আর কত অপেক্ষা করা যায়, বিয়েটা সেরে ফেলা উচিত না ?

পাশাপাশি এগোতে এগোতে একটু চিন্তিত সুরে দূর্বা বলল, উচিত তো···। কিন্তু তুমি বেকার আর আমি গরিবের মেয়ে, কে-ই বা আমাদের বিয়ে করতে আসছে বলো।

বিমূঢ় মুখে বসন্ত রায় দাঁড়িয়েই গেল। জবাবটা পরিষ্কারভাবে মাথায় ঢুকছে না। হাসি চেপে দূর্বা দ্রুত পা চালিয়ে দিল।

দিন তিন চার বাদে দাদুর ডাক পড়ল। ও গিয়ে দাঁড়াতে কিছু বলার আগে দাদু হেসেই বাঁচে না। দূর্বা জিগ্যেস করল, অত হাসার কি হলো ?

—হাসার কি হলো, যতবার মনে পড়ছে হেসে অস্থির হচ্ছি। তুই কি মেয়েরে, ছেলেটাকে বলে দিলি তুমি বেকার আর আমি গরিবের মেয়ে—কে-ই বা আমাদের বিয়ে করবে।

দূর্বাও হেসে ফেলল।

দাদু হাল্‌কা মেজাজে জিজ্ঞাসা করল, অমন একখানা সুন্দর ছেলে, কবি, হাফ-লেখক—তাকেও তোর পছন্দ নয় কেন বল দেখি ?

ঠোঁট উল্টে দূর্বা জবাব দিল, তুমি আমার মাথাটা খেয়ে দিয়েছ, কি আর করা যাবে।

দাদু গম্ভীর।—শুধু মাথাটাই তো খেয়েছি, আর সব খাবার জন্য কে বসে আছে ?

—তুমি একটা অসভ্যের ধাড়ী !

হাসতে হাসতে দাদু বলল, শোন্‌, বেচারা আমাকে ভীষণ ধরেছে, দশ মিনিটের জন্য তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়—এইখেনে, আমার সামনে।

—তোমার সামনে কেন ? তুমি তার হয়ে ওকালতি করবে ?

—আমি ও-ছোঁড়াকে বলে দিয়েছি, সামনে থাকতে পারি, কিন্তু একটা কথাও বলব না।

—তার মানে তুমি আমাদের এখানে মিট করাতে রাজী হয়েছ?

—না করে করি কি, মায়াও তো হয়। আর ভাবলাম, যদি তোর মতি বদলায়।

—ঠিক আছে। পরশু রোববার সন্ধ্যার পরে আসতে বলে দাও।

দাদু তক্ষুণি টেলিফোন তুলল।

যথা সময় বসন্ত রায় এসে হাজির হতে হারুর মারফৎ ওর ডাক পড়ল। হাতের কাজ ফেলে দূর্বা চুপচাপ উঠে এলো। দাদু গুরুগম্ভীর মুখে একটু তফাতে ইজি চেয়ারে গা ছেড়ে বসে আছে। বসন্ত আর একটা চেয়ারে। দূর্বা তার মুখোমুখি দাদুর খাটে বসল।

ঢোঁক গিলে বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করল, ব্যস্ত ছিলে নাকি?

—না। রান্না চড়াতে যাচ্ছিলাম।

বসন্ত রায় একবার ওর মুখের দিকে তাকালো। একবার দাদুর দিকে। তার ভিতরে অনেক কথা। কিন্তু দূর্বা এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। শেষে মরিয়া হয়েই বলে ফেলল, তুমি সেদিন ঠাট্টা করেছিলে বুঝতে পারছি, কিন্তু বিশ্বাস করে তুমি আমাকে বিয়েটা করে ফেলো, আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কি ঠিক হয়ে যাবে?

—বাবা মায়ের ব্যাপারটা···।

—তাঁরা তো তাড়িয়ে দেবেন বলেছেন?

—দিলেও ক'দিন আর ছেড়ে থাকতে পারবে?

—যদি পারেন?

—তাহলে তখন যা-হয় ব্যবস্থা হবে।

দাদু বসে আছে দূর্বার ভ্রুক্ষেপও নেই। চেয়ে রইল একটু। বলল, তাহলে আমারও কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে।

বসন্ত রায় উদ্গ্রীব।—হ্যাঁ, বলো ?

—মাঝারি কোয়ালিটির চালের কিলো কত করে এখন ?

বসন্ত রায় বিমূঢ়। দাত্নকেও দূর্বার দিকে ফিরতে হলো।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে দূর্বা পরপর জিজ্ঞাসা করে গেল, গত দু'মাসে কয়লার দর কত বেড়েছে ? তেলের দাম আর পোস্ট-ম্যানের দামের তফাৎ কত ? দু'জনের মতো রেশনের চাল তেল চিনি আটা ব্ল্যাকে কিনতে হলে কত তফাৎ হয় ? বাজারের ছোট মাছের দরও কতয় চড়ে আছে ?

—থাম্ থাম্—থাম্ বলছি ! তুই কি ওর মাথাটা খারাপ করে দিবি ? দাত্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েও আর চুপ করে থাকতে পারলেন না।

দূর্বা উঠে পড়ল।—যাই, রান্না ফেলে এসেছি। দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বসন্ত রায়ের দিকে চোখ।—বাবা মা যেখানে ঠিক করেন চোখ কান বুজে সেখানেই বিয়েটা করে ফেলো—সুখে থাকবে, এ-সব কিচ্ছু জানার দরকার হবে না—কবিতার খাতাও দেখতে দেখতে ভরে যাবে।

চলে এলো।

তারপর বর্ষার রাতে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা সহযোগে দাত্নর এই নতুন চাকরির প্রস্তাব। কাজ যেমনই হোক, মাস গেলে কড়কড়ে পাঁচশো টাকা মাইনেটা চট করে ভাবা যায় না। রাতে সহজে ঘুম এলো না ! দাত্নর সঙ্গে ফোনে কথা হলেও চাকরিটা যে একেবারে হবেই দূর্বা বোস নিঃসংশয় নয়।...যাঁর পছন্দে চাকরি তিনি অসুস্থ ছেলের মা হলেও মস্ত বড়লোকের ঘরনী ও তেমনি কেতা দুরস্ত খুব শুনেছে। দাত্ন বলছিল, অত টাকা অমন অবস্থা—অথচ শান্তি নেই। বড় ছেলে আর মেয়ে দু'টোরও মতি-গতির ঠিক নেই শুনেছে। চাকরি পেলেও টিকে থাকতে পারবে কিনা—আর বড়লোকের বড় ছেলের মতিই বা কেমন কে জানে।

দূর্বা বোস ভাবনা চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল। যা হয় হবে,

কাজটা পেলে লেগে থাকতেই চেষ্টা করবে। যে জীবন পিছনে ফেলে আজ এই তেইশটা বছরে এসে পৌঁছেছে—নিজেও সে এখন বেপরোয়া কম নয়। তার খুব কিছু হারানো বা খোয়ানোর আতঙ্ক কিছু নেই।

॥ চার ॥

দাত্বর চিঠি সরকার মোটরস্-এর মালিক নিখিলেশ সরকারের স্ত্রী নির্মলা সরকারের নামে। বাড়ির দরোয়ান কার সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে ছাপানো ছোট স্লিপ প্যাড আর পেন্সিল এগিয়ে দিল। নিজের নাম লিখে দূর্বা যাঁর কাছ থেকে আসছে তাঁর নাম অর্থাৎ দাত্বর নামটা শুধু লিখে দিল।

সেকেলে ধরনের ঢাউস বাড়ি। দূর থেকে দেখলে পড়তি বড় লোকের বাড়ি মনে হয়। বাইরের সংস্কার বা চাকচিক্যের দিকে খুব একটা নজর দেওয়া হয়নি। যে দিন গেছে বাইরের জাঁকজমক দেখানোটা খুব নিরাপদ ছিল না বলেই হয়তো এই রকম। কারণ ভিতরে পা দিয়ে মনে হলো এমন তকতকে মহল আর দেখেনি। বসার ঘরটা প্রকাণ্ড। প্রায় সমস্তটা মেঝে জুড়ে নরম দামী গালচে বিছানো। বাইরের জুতোসুদ্ধু পা ফেলতে সংকোচ হয়। ঝকঝকে কভার মোড়া অনেকগুলো সোফা-সেটি পাতা। তার ওপর পুরু ডানলোপিলো। সেগুলোরও পোশাক-আসাক চোখে পড়ার মতো। মাঝে মাঝে সেণ্টার টেবিল, ওগুলোর ওপর এক-একটা ফুলদানীতে ফুল সাজানো। ডিসটেম্পারড দেয়ালের চারদিকে চারটে মস্ত মস্ত অয়েল পেণ্টিং।

দূর্বা বোস সন্তর্পণে একটা সোফায় বসল।

মিনিট তিনেকের মধ্যে পরিচ্ছন্ন বেশবাস পরা একটি মেয়েছেলে এসে তাকে ডাকল, আসুন—

মেয়েছেলেটিকে বড় লোকের বাড়ির আয়া মনে হলো দূর্বার। বয়স্কা। কোথায় যেতে হবে ঠাওর করতে না পেবেও সোফা ছেড়ে উঠে তার সঙ্গ নিল। হল্-ঘরের সামনে চওড়া বারান্দা, ডাইনে মার্বেল পাথরের তেমনি চওড়া সিঁড়ি। মুখ দেখা যায় এমনি পালিশ করা কাঠের রেলিং। দোতলায় উঠতেই গায়ে কাঁটা। প্রকাণ্ড একটা ছাড়া অ্যালসেশিয়ান সোজা দূর্বার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গোঁ-গোঁ শব্দ করে বারান্দার ও-মাথা থেকে এগিয়ে এলো। সঙ্গের মেয়েলোকটি ধমকের সুরে তাকে তফাতে হটাতে চাইল, হুইস্কি! গো!

বড় লোকের বাড়ির পেল্লায় কুকুরের নাম শুনে দূর্বা মুগ্ধ হবার অবকাশ পেল না। ধমকে ভ্রূক্ষেপ না করে মেজাজী কুকুর তার পায়ের কাছটা শুঁকে গলা দিয়ে তেমনি গম্ভীর গোঁ-গোঁ আওয়াজ বার করে সোজা তার দিকে তাকালো। দূর্বা ভয়ে কাঠ।

—ভয় পাবেন না, কিছু বলবে না, চেনা-জানা না হলে ওই-রকম করে। হুইস্কি! গো!

—রাশভারি কুকুর ধীরে সুস্থে প্রস্থান করল। মেয়েলোকটি দূবাকে নিচের তুলনায় ছোট আকারের আর একটা বসার ঘরে নিয়ে এলো। একটু বসতে বলে চলে গেল। এ-ও তেমনি শৌখিন সাজানো গোছানো বসার ঘর। সম্ভবত কর্ত্রীর নিজস্ব এটা। দূর্বা ভালো করে দেখার বা ভাবার অবকাশ পেল না। ভয়ে সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল আবার। নিঃশব্দে ঘরে যে ঢুকল সে ওই বাছুরের মতো কুকুর হুইস্কি। দূর্বা বাইরে কাঠ, ভিতরে ছুটে পালানোর তাগিদ। এমন ভয়ংকর উপদ্রবের কথা দাদু মোটে বলেনি। ওটা পাঁচ হাতের মধ্যে এসে সোজা আবার তার দিকে তাকালো, গলায় গুরুগম্ভীর গোঁ-গোঁ আওয়াজ।

উঠলে বা নড়লে চড়লে বিপদ হতে পারে ভেবে দূর্বা কাঠ হয়ে বসেই রইল। খুব নরম করে মৃদু শুকনো গলায় ডাকল, হুইস্কি....

ওটার মেজাজ ঠাণ্ডা করার তাড়নায় এই চেষ্টা। কিন্তু জবাবে মাঝারি চালের একটা ধমক খেয়ে উঠল। অচেনা লোকের নাম ধরে ডাকার ধৃষ্টতা পছন্দ করে না বুঝিয়ে দিল। দূর্বা তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফেরালো।

পরের পাঁচ সাত সেকেণ্ডের মধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। এবারে যিনি ঘরে ঢুকলেন তিনি কর্ত্রী হবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চাকরি হোক না হোক এ-যাত্রা দূর্বা প্রাণে বাঁচল যেন। তাড়াতাড়ি উঠে ছু'হাত জুড়ে নমস্কার জানালো।

মহিলা মাথা নেড়ে সেটুকু গ্রহণ করলেন। তারপর মুখের দিকে চেয়েই বুঝলেন কিছু। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটার উদ্দেশ্যে ধমকে উঠলেন, ইউ হুইস্কি, কাম হিয়ার! লেজ নেড়ে কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিকে ফিরল। আঙুল তুলে দরজা দেখিয়ে তিনি হুকুম করলেন, আউট! এতটুকু প্রতিবাদ না করে কুকুরটা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

দূর্বার দিকে ফিরলেন।—বসুন, ভয় পেয়েছিলেন বুঝি, হি ইজ্ ফেরোশাস বাট ভেরি ওয়েল ট্রেন্ড্। মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে আসছেন?

সবিনয়ে মাথা নেড়ে হাত ব্যাগ খুলে দাছুর চিঠিখানা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল।

একটা সোফায় বসে পড়ে খাম থেকে চিঠি বার করে পড়তে লাগলেন। সামনের সোফায় আবার সন্তর্পণে বসে দূর্বা তাঁর দিকে তাকালো।...ষাটের কাছাকাছি বয়েস। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। কানের ছু'পাশের আর সামনের দিকের চুল একটু বেশি পাকা। সুন্দরী খুব ছিলেন না হয়তো, তবে সুশ্রী ছিলেন বোঝা যায়। ঝকঝকে চওড়া পাড়ের সাদা জমিনের শাড়ি কুঁচি দিয়ে পরা। গায়ে পাড়ের সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউজ। বাঁ হাতে দামী রিস্ট

ওয়াচ। পায়ে শৌখিন চপ্পল। এ-ই মহিলার ঘরোয়া পোশাক মনে হলো দূর্বার।

চিঠিটা পড়ে সামনেব ছোট টেবিলে রাখলেন। ভালো করে লক্ষ্য করলেন একটু।—মাস্টারমশায়ের সঙ্গে আপনার কত দিনের জানাশোনা?

ফোনে দাছু সবই বলেছেন মনে হয়, তবু যাচাই করাটা অস্বাভাবিক নয়। ইণ্টাবভিউই তো বটে। 'আপনি' শুনেই মনে হলো মহিলাব কালচাবেব ছটা একটু বেশি। সবিনয়ে বলল, আমাব জন্ম থেকেই। আমাকে তুমি কবে বলুন।

আবাব কয়েক মুহূর্তেব নীবব পর্যবেক্ষণ।—এ ধরনের কাজ করার একটু আধটু অভ্যেস আছে?

দূর্বা মাথা নাড়ল। নেই।

—কিছুই কবো না?

—সকালে আব সন্ধ্যায় তুটি মেয়েকে পড়াই।

—নিজে কতটা পড়াশুনা কবেছ?

—বি. এ. পাশ করেছিলাম· ·।

তাঁর চাহিদার সঙ্গে একটু যেন মিলল।—কত দিন আগে পাশ করেছ?

—তু'বছর।

—এম. এ. পড়লে না কেন?

—সুবিধে হয়নি।

প্রশ্নের ফাঁকে লক্ষ্য কবে যাচ্ছেন।—বি. এ. পাশ করে এ-ধরনের কাজ তোমার ভালো লাগবে?

বুদ্ধি করে এবার বেশ ভালো জবাবই দিল।—দাছু বলেছিলেন ভালো লাগবে।

—দাছু।···ও মাস্টারমশাই। দরজার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মিসেস সরকার গলা চড়িয়ে ডাকলেন, সুমতি—!

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দোরগোড়ায় আগের সেই মেয়েছেলেটির মুখ দেখা গেল।

—সাহেবকে একবার আসতে বলো।

দূর্বা মনে মনে ভাবল বাড়িতে এঁরা তাহলে সায়েব মেমসায়েব। কাজ হলে ওকেও মহিলাকে মেমসায়েব বলতে হবে কিনা ভেবে অস্বস্তি একটু। ব্যস্ত পায়ে যে মানুষটি ঘরে ঢুকলেন, বছর পঁয়ষট্টি হবে তাঁর বয়েস। লম্বা তেমন নয়, একটু মোটার দিক ঘেঁষা শরীর। গায়ের রং স্ত্রীর থেকে ফর্সা। পরনে সাদা ট্রাউজার, গায়ে মোটা কলার-অলা গেঞ্জি। কাঁধের ওপর ধপধপে তোয়ালে। সদ্য শেভ সেরে আসছেন বোঝা যায়। দু'কানে এখনো সাবান লেগে আছে।

তাঁকে দেখেই দূর্বা সোফা ছেড়ে আবার সবিনয়ে উঠে দাঁড়াল।

তার দিকে চেয়ে নিখিলেশ সরকার মাথা নাড়লেন।—গুড্ মর্নিং, সীট ডাউন প্লীজ। স্ত্রীর দিকে ফিরলেন। তাইতেই বোঝা গেল তাঁর এখন বসার সময় নেই।

নির্মলা সরকার বললেন, এঁর নাম দূর্বা বোস, বিজুর জন্য মাস্টারমশাইকে একজন কমপেনিয়নের কথা বলেছিলাম, তিনি পাঠিয়েছেন। এই চিঠি—

চিঠিটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

—দ্যাট্স অল্ রাইট। আর একবার দূর্বাকে দেখে নিয়ে স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, মাস্টারমশাই যখন পাঠিয়েছেন আর কথা কি, তুমি কথা বলে সেট্ল করে নাও···সি ইজ ভেরি ইয়ং অ্যাণ্ড্ দি জব্ ইজ টায়ারসাম, সব জেনে উনিও ডিসাইড্ করুন। রাজি থাকলে বিজুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও, ও কি বলে দেখো, ওকে নিয়েই তো যত মুস্কিল। আবার দূর্বার দিকে ফিরলেন, আই অ্যাম ইন এ হারি, এক্সকিউজ মি···

লঘু পায়ে চলে গেলেন। আবার নির্মলা সরকারের পালা। এবারে গম্ভীরই একটু।—আমার ছোট ছেলের সম্পর্কে সব শুনেছ?

—দাছু মোটামুটি বলেছেন।

মহিলা সামান্য মাথা নাড়লেন।—হ্যাঁ···ছেলেও ওঁকে লাইক করে। তা শোনো, তোমাকে খোলাখুলি বলি, পাঁচ সাত দিন এসে তুমি ট্রায়েল দিয়ে দেখে নাও তোমার কি রকম লাগে, আর আমিও দেখি ছেলের কি-বকম লাগে। ওর ভালো লাগাটা কত দরকার বুঝতেই পারছ....আগে ছু'জন নার্স ছিল, কিন্তু একজনকেও ওর তেমন পছন্দ নয় দেখে আমাকে অন্য চেষ্টা কবতে হচ্ছে। অবশ্য যে ক'দিন ট্রায়েল দেবে সে ক'দিনের টাকাও তুমি পাবে। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ডিউটি শুনেছ বোধহয়?

দূর্বা মাথা নেড়ে জানালো শুনেছে। ট্রায়েল শুনে একটু অনিশ্চয়তাও বোধ করছে। মহিলা আবার দরজার দিকে মুখ ফেরালেন।—সুমতি!

সুমতি বাড়ির আয়া এটা এখন স্পষ্ট। সে আসতে জিজ্ঞাসা করলেন, বিজু কি করছে?

—ছবি আঁকছে।

—ইনি ওর সঙ্গে কথা বলবেন, জিগ্যেস করে এসো ও আসবে না এঁকে ওর ঘরে পাঠাবো।

দূর্বা আবারও মনে মনে ঘাবড়ালো একটু। কি মেজাজের ছেলে কে জানে যে মা-কে এই অনুমতিও নিতে হচ্ছে।

কিন্তু সুমতি আর ফিরল না। তার বদলে ছেলেটাই এলো। তার এক হাতে ওই ভয়ংকর কুকুরটার লম্বা কান পাকড়ানো। কান ধরে টেনে ওটাকেও সঙ্গে নিয়ে আসছে, কিন্তু সে-জন্যে অমন জাঁদরেল কুকুরটার একটুও আপত্তি বা মান অভিমান নেই। সুড়সুড় করে সঙ্গে আসছে।

ছেলেটাকে দেখামাত্র দূর্বার বুকের তলায় একটা অদ্ভুত মোচড় পড়ল। ষোল বছর বয়েস শুনেছে কিন্তু দেখলে আরো কচি মনে হয়। না কালো না ফর্সা। দাছু বলেছিল, ভারী মিষ্টি ছেলেটা।

কিন্তু মিষ্টি বললে সবটা বলা হয় না। ঠোঁটের ফাঁকে দুষ্টু দুষ্টু হাসি, বড় বড় দুটো স্বপ্নালু চোখ, যেন দূরের কিছুতে তন্ময়—আবার সোজা তাকালে চোখের আয়ত গভীরে একটু যেন কৌতুকের ছোঁয়া। পরনে সামান্য খাটো পা-জামা, গায়ে খুব দামী সাদা কাপড়ের ওপর কালো ডোরা কাটা হাফ শার্ট। মুখের দিকে তাকালে মনে হয় ছেলেটা তার শীর্ণ দেহটা নিয়ে বেশ ক্লান্ত—অথচ ফ্যাকাশে মুখখানা সপ্রতিভ।

তাকে দেখেই মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, খুব মিষ্টি করে ডাকলেন, আয়রে বিজু, তোর কাছে কে এসেছেন দেখ—ওঁর নাম মিস্ দূর্বা বোস, তোর সঙ্গে গল্প করার জন্যেই এসেছেন। ওঁকেও মাস্টারদাদু খুব ভালবাসেন।

কি করবে ঠিক না পেয়ে দূর্বাও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেটার একটা হাতে তখনো কুকুরটার এক কান ধরা। এটুকু ছেলের সঙ্গে গল্প করতে আসাটা যেন অবাক হবার মতো কিছু নয়। সকৌতুকে একটু দেখল। তারপর বলল, আমার নাম বিজন সরকার—বাড়ির সকলে বিজু বলে ডাকে।

বুকের ভিতরটা তখনো এক অজানা দরদে খচখচ করছে দূর্বার। হেসেই বলল, আমি তো অনেক বড় দিদির মতো···আমিও বিজু বলে ডাকব তো?

হাসছে অল্প অল্প। হাসিটা অদ্ভুত সুন্দর। ফিরে জিগ্যেস করল, আমার দিদিদের মতো দিদিগিরি ফলাতে আসবে না তো?

দূর্বা অপ্রস্তুত।

তার মা হাসি মুখে হালকা শাসন করলেন, ইউ নটি বয়, দিদিরা কত ভালবাসে তোকে। দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বোস্—তুমিও বোসো। ···তুই গল্প কর, আমি এঁকে একটু চা-টা দিতে বলি, কেমন? তুই খাবি কিছু?

—নাঃ। মায়ের দিকে তাকালোও না। কান ধরে কুকুরটাকে

সোফার কাছে নিয়ে এলো। হাঁটু দিয়ে ওর পেটের কাছে একটা গুঁতো মেরে হুকুম করল, লাই ডাউন! দূর্বা অবাক হয়ে দেখল ওই বিশাল কুকুর তক্ষুণি বাধ্য বাচ্চার মতো সোফার সামনে কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ল। ছেলেটা সেই সোফায় বসে হুটো পা-ই অনায়াসে ওর পিঠের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তার দিকে তাকালো। একবার ফিরে দেখল মা ঘর ছেড়ে চলে গেছে কিনা। তারপর অল্প অল্প হেসে মজার গোপন কিছু ফাঁস করার মতো করে বলল, দিদিরা আমাকে একটুও ভালবাসে না, বুঝলে ?

খুব নরম কবে দূর্বা বলল, তোমাব মতো ভাইকে কেউ ভাল না বেসে পাবে ?

হাসি ছোঁয়া হু'চোখ তাব মুখেব ওপব আটকে রইল একটু। —তোমাব ভাই আছে ?

দাদা ছিল আব নেই শুনলে ধাক্কা খেতে পাবে ভেবে বলল না। মাথা নাড়ল। নেই।

ছেলেটা এবার বলল, বাঃ, আমি বসলাম, তুমি বসছ না কেন!

জবাব না দিয়ে দূর্বা কুকুরটার দিকে তাকালো। গায়ে কাঁটা দেওয়া বা সিঁটিয়ে যাবার মতো অত ভয় এখন করছে না অবশ্য, তবু ওটার এক দেড় হাত ফারাকে মাটিতে পা রেখে বসতে একটু অস্বস্তি। তবু বসল। কুকুরটা তখুনি মাথা তুলে তাকালো একবার। দূর্বা তাড়াতাড়ি হু'পা অন্য দিকে সরালো।

বিজু হেসে উঠল।—হুইস্কিকে এত ভয় পাচ্ছ কেন, ও খুব ভালো —মানুষের থেকেও ভালো।

এই ছেলের মুখে শেষের কথা কানে লাগার মতো। দূর্বা বলল, না আমাকে তো এখনো ভালো চেনে না···

বিজু উৎসাহ বোধ করল, আচ্ছা আমি চিনিয়ে দিচ্ছি। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, নড়তে দেখেই কুকুরও দাঁড়িয়ে গেছে। কান ধরে ওটাকে একেবারে দূর্বার পায়ের 'কাছে নিয়ে এলো।—

হুইস্কি! আঙুলে করে দূর্বার পা দেখালো।—লাই দেয়ার! লাই ডাউন!

দূর্বার আবার অস্বস্তি। পা সরাতে চেষ্টা করে বলে উঠল, থাক থাক, আস্তে আস্তে ঠিক চিনে নেবে—

তার মুখে স্পষ্ট ভয় দেখে বিজু মজাই পেল। কুকুরটার পিঠে সশব্দে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে কড়া ধমক লাগালো, হুইস্কি! লাই দেয়ার!

এবারে ওই বিশাল কুকুর দূর্বার পা ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। পা থেকে চার আঙুলের মধ্যে।—তুমি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে এবারে একটু আদর করো. কিচ্ছু বলবে না।

ভয়ে ভয়ে দূর্বা ওটার গায়ের কাছে হাত আনতেই গলা দিয়ে গম্ভীর আপত্তির গর-গর শব্দ বার করল একটা। দূর্বা সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে নিল।

—এই হুইস্কি, এবার তোর আমি কান দুটো ছিঁড়ে নেব বলে দিলাম। একেবারে কাছ ঘেঁষে এসে হাঁটু মুড়ে বসল। তারপর দূর্বার একটা হাত টেনে নামিয়ে ওটার গায়ে বোলাতে লাগল। আর আপত্তি জানাতে গেলে সুবিধে হবে না জাঁদরেল কুকুরও যেন বুঝল।

উঠে বিজু আবার সোফায় বসল। দূর্বার ভয় কাটল বটে, অস্বস্তি একেবারে গেল না। কুকুরের মেজাজপত্র তার একটুও জানা নেই। আর এটাকে তো দেখলেই গা শিরশির করে। কিন্তু শ্রান্তমুখ ছেলেটাকে অদ্ভুত ভালো লাগছে। জিগ্যেস করল, ওর হুইস্কি নাম কে রাখল?

—বড়দা। তার আবার এ-সব বেশ চলে তো। আমার অসুখের পর হুইস্কিকে চাইতে বড়দা আমাকে দিয়ে দিল।

মদের নেশা কাকে বলে দূর্বা হাড়ে হাড়ে জানে। শুনেই অস্বস্তি। জিজ্ঞেস করল, বড়দা তোমাকে খুব ভালোবাসেন বুঝি?

—ছাই ভালোবাসে, আমার ঘরে আসেই না মোটে। সাফ জবাব।

মদ খায় শুনেই বাড়ির অদেখা অচেনা একটা লোককে নিয়ে দূর্বার ভাবনা ধরে গেছে। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে। ভাইয়েব ঘরে আসেই না শুনে তবু স্বস্তি একটু।

কুকুবটা এবারে আড়মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর গজেন্দ্র গমনে দবজাব দিকে এগুলো। ছেলেটার সামান্য মজা-ছোঁয়া ছ'চোখ তার মুখেব ওপব।—মাস্টাব দাছ তোমাকে ভালোবাসে?

দূর্বা খুশি মুখে মাথা হেলালো।—খু-ব।

—মাস্টার দাছ গ্র্যাণ্ড—না?

—দারুণ গ্র্যাণ্ড। তোমাকে তিনি কত ভালোবাসেন তা-ও জানি।

শুকনো মুখের ছুষ্টু ছুষ্টু হাসিটুকু এত সুন্দব যে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তোয়াজ করা হচ্ছে একটু তা-ও যেন বুঝতে পারে।

ট্রে-তে পেয়ালায় চা আর একটা প্লেটে এক পিস কেক আর ছুটো ভালো বিসকিট নিয়ে সুমতি এলো। ছ'জনের মাঝের ছোট টেবিলে ট্রে বেখে খুব মিষ্টি করে বিজুকে বলল, ছোট পেয়ালায় এক পেয়ালা ছুধ নিয়ে আসি বাবা?

—নাঃ! বিরক্ত।

—তাহলে এই দিদির সঙ্গে বসে একটু কেক খাও…আনি?

রেগেই গেল। ফ্যাকাশে মুখ লাল একটু।—হ্যাঁ নিয়ে এসো। —ডিশসুদ্ধু আছড়ে ভেঙে শেষ করে দেব—সব-সময় কেবল খাও-খাও-খাও।

সুমতি দ্রুত চলে গেল। বিরক্ত মুখে বিজু দূর্বার দিকে তাকালো।—আমি একটুও রাগ করতে চাই না আর ওরা আমাকে রাগিয়ে দেবেই।

দূর্বা চুপচাপ বসে। ক্লান্ত মুখের এই রাগ দেখেও বুকের ভিতরে

মোচড় পড়ছে। ওর ভিতরে নিঃশব্দে কেউ যেন সেই থেকে হায়-হায় করছে।

—কি হলো, চা খাও ?

দূর্বা হাসতে চেষ্টা করল।—তোমার রাগ দেখে ভয় পেয়ে গেছি, যা বলতে যাচ্ছিলাম তা বলতে আর সাহস পাচ্ছি না…।

তরল তক্ষুণি।—তোমার ওপর রাগ করেছি নাকি! কি বলবে ?

—বকবে না ?

—তোমাকে বকতে যাব কেন ?

—ছোট ভাইকে সামনে বসিয়ে এতবড় দিদি একলা কখনো খেতে পারে ? এখান থেকেই যা-হোক একটু খেলে একসঙ্গে খাওয়ার মতো হতো।

ছেলেটা থমকালো একটু। তারপর ঠোঁটে হাসি ভাঙল।—তুমি চালাক মেয়ে। ডিশটার দিকে তাকালো।—আচ্ছা একটু কেক ভেঙে দাও, বেশি দিলে খাব না কিন্তু।

দূর্বার এটা বড় রকমের জয় মনে হলো। শশব্যস্তে উঠে বিস্কুট দুটো পেয়ালার ডিশে সরিয়ে চামচে দিয়ে আধখানা কেক কেটে নিল। বাকি আর্ধেকও পেয়ালার ডিশে সরিয়ে এই ডিশ আর চামচ হাতে বিজুর চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল।

বিজু অবাক একটু। হাত বাড়ালো।—দাও ?

দূর্বার ঠোঁটে টিপ-টিপ হাসি, চোখেও। চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়ল। বলল, ছোট ভাইকে নিজের হাতে খাওয়াতে কেমন লাগে দেখব…।

ছেলেটা সকৌতুকে চেয়ে থেকে হেসে ফেলল।—তুমি খুব দুষ্টু। হাঁ করল. দাও—একবারে বেশি দিও না।

চামচেয় করে কেক কেটে কেটে ওর মুখে দিতে লাগল। ছেলেটা খাচ্ছেও, হাসছেও।

নির্মলা দেবী ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালেন। প্রায়

অবিশ্বাস্য কিছু দেখছেন যেন। হেসে কাছে এসে দাঁড়ালেন।—কি রে, দিদির সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে বুঝি?

ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বিরক্ত।—হ্যাঁ হয়েছে, খাচ্ছি দেখে খুশি হয়েছ তো—এখন যাও!

দূর্বা অপ্রস্তুত একটু। ওর মা বললেন, ঠিক আছে, তুই গল্প কর্, আমার কত কাজ পড়ে আছে—

চলে গেলেন। কেকটুকু শেষ করে বিজু দূর্বার হাতেই জল খেল। জল.খাওয়া হতে দূর্বা নিজের পরিষ্কার রুমালে তার মুখ মুছিয়ে দিল। তারপর নিজের চা নিয়ে বসল।

চোখে চোখ রেখে বিজু হাসছে।

—হাসছ যে?

—তুমি কেন এসেছ আমি জানি।

দূর্বা থতমতো খেয়ে জিগ্যেস করল, কেন?

—নার্স দুটোর একটাও আর নেই তো, সেইজন্য রণদা তোমাকে পাঠিয়েছে।

খেয়াল না করে দূর্বা জিজ্ঞাসা করল, রণদা কে?

—বাঃ, রণদা-কে চেনো না! রণিত—ছোড়দার খুব বন্ধু ছিল, আমাকে দারুণ ভালোবাসে। অবাকও একটু, রণদা পাঠায়নি তোমাকে?

দূর্বার মনে পড়েছে। সত্যি কথাই বলল, তিনি তোমার মাস্টার দাদুকে বলেছেন, দাদু আমাকে পাঠিয়েছেন। চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, দু'জন নার্সের একজনকেও তোমার পছন্দ হলো না কেন?

—কি করে হবে, একজন আমি যা চাই তা করে না, কেবল বলে, এখন এটা করো, এখন ওটা করো, চোখ বুজে শুয়ে বিশ্রাম করো। আর একজন দুপুরে গপ্প করতে করতে বা বই পড়তে পড়তে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়, ডাকলে বলে, কই ঘুমোইনি তো—একটু বাদেই

আবার ঝিমোয়। সমস্তক্ষণ আমার কাছে থাকতে কারো ভালো লাগে না—তোমারও দু'দিন বাদেই ভালো লাগবে না—দেখো।

ছেলেটা সরল বটে, নির্বোধ নয় একটুও। দুটো ডাগর চোখে দূরের বিষণ্ণ ছায়া। দূর্বার বুকের তলায় আবারও মোচড়। সামনে ঝুঁকে সাগ্রহে বলল, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগছে, পরে আরো ভালো লাগবে....তোমার ভালো লাগবে কিনা আমার সেই চিন্তা।

চুপচাপ চেয়ে রইল একটু। নিঃসংকোচে যাচাই-ই করছে মনে হলো।—তুমি গান করতে পারো?

দূর্বা অপ্রস্তুত। মাথা নাড়ল। পারে না।

—ছবি আঁকতে পারো?

এবারও ফেল। বিমর্ষ মুখে আবার মাথা নাড়তে হলো। পারে না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ছেলেটা ওকে বাতিল করল মনে হলো না।—বই পড়ে শোনাতে আর ভালো ভালো গল্প বলতে পারো তো?

এবারে সাগ্রহে সায় দিল।—তা খুব পারি, তুমি যত শুনতে চাও।

—ছবি আর গানও তোমার খুব ভালো লাগে তো?

—খুব ভালো লাগে।

—আমার অনেক রেকর্ড আছে, যখন যে-টা বাজাতে বলব বাজাবে। আর আমি নিজেই ছবি আঁকতে পারি, একজন আর্টিস্ট সপ্তাহে দু'দিন করে এসে শিখিয়ে যায়। তুমি চুপ করে বসে থাকলে তোমার মুখও এঁকে ফেলতে পারি। আচ্ছা আমার ঘরে চলো, তোমাকে সব দেখাই।

উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দূর্বাও। ছেলেটার শ্রান্ত মিষ্টি মুখের দিকে চেয়ে ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল। বাইরে আসতে নির্মলা সরকার হাত ধরাধরি করে চলার দৃশ্যটাও দেখলেন। খুশি নিশ্চয়, কিন্তু নতুন মেয়েকে সেটা বুঝতে দেবার ইচ্ছে নেই।

একেবারে শেষের কোণের ঘর থেকে একটা রিম-ঝিম আওয়াজ আর সেই সঙ্গে তবলার মৃদু মিঠে আওয়াজ কানে এলো। এই সকাল ন'টায় ওখানে ঝুমুর-পায়ে কেউ নাচের মহড়া দিচ্ছে বোঝা যায়।

বিজুর সঙ্গে তার ঘরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর। দামী টাইলের মেঝে। হাল্‌কা সবুজ ডিসটেমপার্ড দেয়াল। দেয়ালের এক-পাশে একটাই বড় খাটে পুরু গদির বিছানা। দেয়ালের তাকে রেকর্ড প্লেয়ার আর রেকর্ডের বাক্স। পাশাপাশি দুটো ছোট কাচের আলমারি বোঝাই নানারকমের চকচকে বই। মাঝারি সাইজের টেবিলের দু'দিকে ছোট দুটো শৌখিন চেয়ার। টেবিলের ওপর আঁকার সরঞ্জাম ছড়ানো।

আঁকার খাতাটাও টেবিলে পড়ে আছে। দূর্বা সাগ্রহে উল্টে দেখতে লাগল। কাঁচা হাত হলেও আঁকার বিষয় স্পষ্ট আর পরিচ্ছন্ন। নানা রকমের ফুল, মায়ের ছবি, বাবার ছবি, আবার অচেনা মুখের ছবিও, নানা পোজের হুইস্কির ছবি। একজন নার্সের বই হাতে ঝিমুনো আর ঘুমন্ত ছবি তিন চারটে। আর একটি মাঝ-বয়সী নার্সের টান ধরা কড়া-মুখের স্কেচ গোটা দুই। এই দুই নার্সের ছবিগুলো দেখে দূর্বা বিজুর দিকে চেয়ে হেসে ফেলল। বিজুও হাসতে লাগল, বলল, ওই ছবি দেখে নার্সদের মনে মনে রাগ, পাছে বাবা মা বা দিদিরা দেখে ফেলে।

ও-দিক থেকে নাচ আর তবলার রিমঝিম আর ডুপ্‌-ডুব শব্দ আরো একটু স্পষ্ট হলো। দূর্বা জিজ্ঞাসা করল, ও-দিকে কেউ নাচ শিখছে নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে কচি মুখে বিরক্তির ছায়া।—হ্যাঁ—ছোড়দি—সময় অসময় নেই কেবল নেচেই চলেছে—থামাতে বলে দেব?

—না-না, আমি এমনি জিগ্যেস করছিলাম। ছেলেটার প্রতি-পত্তির কথা শুনে অবাকও একটু।—তুমি থামাতে বললেই নাচ থেমে যাবে?

—যাবে না মানে? দেখবে?

—না না, আমার একটুও খারাপ লাগছে না।

বিজুর ঠোঁটে দুষ্টু দুষ্টু হাসি।—এ বাড়িতে আমার কথা সব্বাইকে শুনতে হয়।

দূর্বা এবারে আলমারির বই দেখতে লাগল। থাকে থাকে ছবির বই, ছবিতে গল্প। এ-ছাড়াও দেশবিদেশের ইংরেজি বাংলা অনেক রকমের গল্পের বই। দূর্বা জিগ্যেস করল, এত বই তোমার সব পড়া হয়ে গেছে নাকি?

—আমার পড়তে ভালো লাগে না। বইগুলো পড়ে শোনালে ভালো লাগে। আর ইংবেজি কিছুই প্রায় বুঝি না, কেউ পড়ে সুন্দর করে গল্প বললে ভালো লাগে। কত ভালো ভালো ইংরেজি বই ওখানে দেখো, বড়দা কিনে আনে, রণদা কিনে আনে, বউদিও এক-এক সময় কেনে—কিন্তু নার্সরা নিজেরাই ইংরেজি বই ভালো পড়তে পারে না, আমাকে গল্প বলবে কি।

এত কথার মধ্যে 'বউদি' শব্দটা কানে আটকেছে। জিগ্যেস করল, বউদি মানে তোমার নিজের বউদি…?

—নিজের বউদিই ছিল, পাঁচ ছ' বছর আগে বড়দার সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে—আমাকে ভালোবাসে বলে এখনো মাঝে মাঝে দেখতে আসে।

দূর্বা সশঙ্কে একবার দরজার দিকে তাকালো। কি গল্প হচ্ছে কারো কানে গেলে কিছু মনে করা অস্বাভাবিক নয়। তাড়াতাড়ি কথা ঘোরালো।—রাতে এ-ঘরে তুমি একলা শোও?

—না, ওই কোণের মেঝেতে সুমতি মাসি শোয়। সুমতি মাসিও খুব ভালো।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ-বাড়ির সকলের কথাই শোনা হলো। একজন বাকি। ছোড়দি নাচে বোঝা গেল। বাকি বড়দি। জিগ্যেস করল, তোমার দুই দিদি শুনেছিলাম, বড়দি শ্বশুর বাড়িতে নাকি?

বিজু মজাই পেল।—বিয়ে না হলে আবার শ্বশুর বাড়ি হয় কি করে! বড়দি বিয়েও করবে না. শ্বশুর বাড়িও যাবে না। কি মনে পড়তে আরো উৎফুল্ল।—বড়দিকে দেখবে?

জবাবের অপেক্ষা না রেখে ফড়ফড় করে টেবিলের ড্রইং খাতার পাতা ওলটালো কয়েকটা।—এই দেখো!

দুষ্টু ছেলে নিজের মন থেকে এঁকেছে দেখলেই বোঝা যায়। খরখরে মুখ, চিমসে গাল ফুলিয়ে রাখা হয়েছে, নাকের ডগায় চশমা, এক হাতে বুকের কাছে একটা বই ধরা অন্য হাতে উচনো বেত।

দরজার দিকে আর একবার দেখে নিয়ে দূর্বা জিগ্যেস করল, এ-রকম এঁকেছ কেন? বড়দি রাগী নাকি খুব?

—রাগী ঠিক না। সব-সময় এ-রকম করে থাকে—নিজের দু'গাল ফুলিয়ে দেখালো—বড়দি খৃশ্চান হয়ে গেছে তো, মিশনারি স্কুলে পড়ায়, সেখানকার হস্টেলে থাকে, শনি রোববার বাড়ি আসে। হাসছে। —স্কুলের মেয়েরা বড়দিকে দারুণ ভয় করে, সেই জন্যেই হাতে বেত দিয়েছি—দেখলে আমাকেও যা লেকচার ঝাড়তে শুরু করবে না! নিজেই খুব হাসতে লাগল।

দূর্বা আর ঘাঁটাতে সাহস করল না তাকে। অনুমতি নিয়ে আলমারি থেকে কয়েকটা ইংরেজি গল্পের বই বেছে নিল। এই বই যখন আছে গল্পের স্টকের জন্য চিন্তা নেই।

বিজু এবারে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল।—আজ অনেক হাসলাম আর অনেক কথা বললাম,ভালো লাগছে, তুমি কাল থেকে আসছ তো?

শোবার পর একটু বেশি শ্রান্ত দেখাচ্ছে ছেলেটাকে। দূর্বা জবাব দিল, তুমি যেমন বলবে।

—আচ্ছা কাল এসো। কখন আসবে?

—তোমার মা আটটায় আসার কথা বলেছিলেন···।

ভাবল একটু। মাথা নাড়ল।—কাল শনিবার, দশটায় এসো, আটটায় আমার আঁকার মাস্টারমশায় আসবে।

নিজের ঘরে না ঢুকে দূর্বা আগে দাদুর কাছে চলে এলো। ওকে দেখে একগাল হেসে রাধাকান্ত বললে, মেরে দিয়েছিস তো, আর ভাবনা কি—তোর কেমন লাগল বল্—

—বিচ্ছিরি—খুব বিচ্ছিরি—এ-রকম জানলে আমি যেতাম না। ছেলেটাকে দেখার পর থেকে আমার আর কিচ্ছু ভালো লাগছে না—এত মন খারাপ হয়ে গেছে।

রাধাকান্ত প্রথমে অবাক হয়ে গেছলেন। পরে বুঝলেন। বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তা আর কি করা যাবে, ভগবানের মার—

দূর্বা রেগেই উঠল।—ভগবান টগবান থাকলে অমন সুন্দর ছেলের এ-রকম হয়।

—যাক, ওর মায়ের সঙ্গে কি কথা হলো?

—এক সপ্তাহ ট্রায়েলের পর পাকাপাকি হবে।

—সে-কি রে! দাদু বেশ অবাক।—তুই সেখানে যাবার এক ঘণ্টার মধ্যেই তো বউমা মানে বিজুর মা আমাকে টেলিফোন করে জানালো, তার ছেলের তোকে খুব পছন্দ হয়েছে—আবার ট্রায়েল-ফায়েল কি?

দূর্বা জানালো, ছেলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবার আগে ও-রকম কথা হয়েছিল। আসার আগে আর কিছু বলেন নি।

যাচাইয়ে উৎরোবে কিনা দূর্বা সে-নিয়ে আর মাথা ঘামায় না, বা কারো সুপারিশও আর চায় না। অমন একটা ছেলে যদি ওকে পছন্দ না করে, বা তার সেবার যদি অযোগ্য হয় তাহলে এ চাকরি না হওয়াই ভালো। এই ছেলের সামনে দু'দুটো নার্স অমন পেশাদারী হয়ে গেছল কি করে দূর্বা ভেবে পায় না। একটু আধটু গান জানে না বা আঁকতে পারে না বলে দুঃখ হচ্ছে। জানলে বা পারলে ছেলেটার হয়তো আরো ভালো লাগত। গান-টান আর গলায় আসবে না, কালকের দিনটা বাদ দিয়ে ওর আঁকার মাস্টার আসার দিনেও আগে গিয়ে দেখে দেখে যদি একটু হাত মক্স করতে পারে। স্কুলে পড়তে খুব মন্দ আঁকত না।

···কিন্তু শেষের সেই ভয়ংকর দিন যদি হঠাৎ এসে পড়ে? মনে মনে দূর্বা সেই সম্ভাবনার শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিতে চাইল। এ রকম হতে পারে না, কখনো হতে পারে না। দাদুর কথাই ঠিক হবে। দু'চার বছর কাটিয়ে দিতে পারলে ঠিক কোনো ওষুধ বেরিয়ে যাবে। যাবেই।

পরদিন ঘড়ি ধরে ঠিক দশটায় হাজিরা দিল। আজ আর দরোয়ান চিরকুট চাইল না, ওপরে চলে যেতে বললো। সিঁড়িতে পা দিয়েই হুইস্কির ভাবনা। চিনতে পারবে না তেড়ে আসবে কে জানে। সিঁড়ির বাঁক পর্যন্ত উঠে আবার দাঁড়ালো, কাউকে যদি চোখে পড়ে। আয়া ছাড়া বাড়িতে আরো দুটো চাকর আছে।

দেখা প্রথমে হুইস্কির সঙ্গেই। সে বারান্দায় টহল দিচ্ছিল। দাঁড়িয়ে গেল। গলা দিয়ে গরগর শব্দ বার করল একটু। অল্প অল্প লেজও নাড়ল। দূর্বার মনে হলো এটা ঠিক রাগের লক্ষণ নয়। ওর চোখের দিকে চেয়ে সুন্দর করে হাসল একটু। হুইস্কি আবার হেলেদুলে ফিরে চলল। তার ছোট্ট মনিবের ঘরেই ঢুকে গেল। যেন তাকে খবর দিতে চলল।

পায়ে পায়ে বাকি ক'টা সিঁড়ি টপকে দূর্বা দোতলায় বারান্দায় উঠে এলো। তারপর পা বাড়াবার আগেই বসার ঘর থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এলো। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, চোখে পুরু লেন্স-এর চশমা, লালচে ছাটা চুল কাঁধ ছুঁয়ে আছে। বছর তেত্রিশ চৌত্রিশ হবে বয়েস। দূর্বা এই প্রথম দেখল তাকে, কিন্তু দেখামাত্র চিনেছে। বিজুর আকার সঙ্গে খুব যে মেলে এমন নয়। সব মিলিয়ে রসশূন্য টান-ধরা ভাবটুকু মেলে।

দরজার বাইরে পা দিয়ে দূর্বার দিকে সোজা তাকালো। কি চাই বা কাকে চাই প্রশ্নটা শুধু চোখে।

··বিজু তার ঘরে?

জবাবে মহিলার ঠাণ্ডা দু'চোখ দূর্বার আপাদমস্তক নামা-ওঠা করল একবার।—তুমি দূর্বা বোস?

দূর্বার তক্ষুণি মনে হলো, স্কুলের কড়া শিক্ষয়িত্রীই বটে। যেন সে-ও ছাত্রী বা ছাত্রীর মতো কেউ। সবিনয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল।

—আমি বিজুর বড়দি, কমলা সরকার। আজ সকালেই মা তোমার কথা বলছিল। বিজু তার ঘরেই আছে, এসো—

সঙ্গে নিয়ে চলল। আজ আর শেষের ঘর থেকে নাচ বা তবলার শব্দ কানে আসছে না। বিজুর বড়দির এত বয়েস দূর্বা ভাবেনি। সরকার বাড়ির ছেলে-মেয়ের মধ্যে এই সব থেকে বড় কিনা জানে না।

কমলা সরকার হঠাৎ গলা খাটো করে বলল, বিজু নাকি কাল তোমার হাতে খেয়েছে?

দূর্বার আপাতত এটাই সব থেকে বড় সার্টিফিকেট বোঝা গেল। সে তার মুখের দিকে চেয়ে হাসল একটু।

—দাঁড়াও, তোমাকে দুটো কথা বলে রাখি। কতবড় অসুখ বা কি অসুখ বিজু সেটা জানে না, কিন্তু বেশ গণ্ডগোলের কিছু যে এটা বেশ বুঝে ফেলেছে। এ-জন্যেই ওর মতলব আর মর্জি-টর্জিগুলো বেড়েই যাচ্ছে মা সেটা বুঝতে চায় না। খাওয়ার নামে মারতে আসে অথচ তোমার হাতে খেলো—এই থেকেই বুঝতে পারছ ইচ্ছে করেই অনেক সময় ও গোঁয়ারতুমি করে। ও তোমাকে পছন্দ করেছে বলে তুমি যেন ওকে বেশি প্রশ্রয় দিতে যেও না। আমি দাদা আর রমলা ছাড়া সক্কলেই তাই করছে—

কথার মাঝে দূর্বার সিঁড়ির দিকে চোখ গেল। কারণ ও সেদিকে ফিরেই কথা শুনছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলার বারান্দায় উঠলেন নির্মলা সরকার। বড় মেয়েকে ওর সঙ্গে কথা বলতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। এই কারণেই অখুশি না হোক, একটু উতলা কিনা দূর্বা ধরতে পারল না।

কমলা সরকার ফিরতেই উনি ব্যস্ত মুখে সামনের ঘরে ঢুকে গেলেন। কমলা সরকার টান হয়ে বসার ঘরের দিকে চলল। দূর্বা

ফ্যালফ্যাল কবে সেদিকে চেয়ে রইল খানিক। যা বলে গেল তার সাদা অর্থ, অসুখের জন্য শুধু সে দাদা আব রমলা ছাড়া আর সকলেব কাছে ভাই বেশি প্রশ্রয় পায় আর বেশি বিগডয়। বাবা মা ছাড়া আব বাকি থাকল কে দূর্বা জানে না। বোধহয় সুমতি।···রমলা ছোট বোন হবে। বড় বোনকে দেখে আব তার কথা শুনে দূর্বার গলা জিভ শুকিয়ে যাচ্ছিল। তবু রক্ষে সপ্তাহের পাঁচটা দিন সে এখানে থাকে না। কিন্তু নাচিয়ে ছোট বোন আবাব কেমন হবে কে জানে। কেবল একটু যা স্বস্তি, দাদা বলল যখন, বাড়িব বড ছেলে কমলা সরকাবেব থেকেও বড। একে মদ খায়, তায় বউয়েব সঙ্গে ছাডাছাডি—শোনাব পব থেকে দূর্বাব ভিতবে একটু অস্বস্তি থিতিয়েই ছিল। ঘব-পোডা গোরু সিঁদুবে মেঘ দেখলেও ডবায়। বড় ছেলে বুড়ো শুনলে আবো নিশ্চিন্ত হতো।

—তোমাব দশটায় আসাব কথা ছিল, দশটা দশ হয়ে গেল। ঘবে পা দেওয়াব সঙ্গে সঙ্গে বিজুব গম্ভীব অনুযোগ।

– খুব অন্যায় হয়ে গেল। তোমাব বড়দির সঙ্গে একটু আলাপ কবতে হলো তো···।

—সঙ্গে সঙ্গে তবল মুখ।—ও, বড়দিব পাল্লায় পড়েছিলে? তোমাকে অনেক উপদেশ দিল না?

—না ··ভালো কথাই তো বললেন।

—কি ভালো কথা?

দূর্বা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল। ওর সততার সম্পর্কে এই ছেলের মনে এতটুকু সংশয়ের আঁচড পড়ুক, চায় না। হুইস্কি কাছে এসে দূর্বার শাড়িসুদ্ধু পায়ের কাছটা শুঁকল একবার, তারপর টেবিলটার ওদিকে তাব ছোট মনিবের ধার ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ছেলেটার হাসি-ছোঁয়া দু'চোখ তখনো তার মুখের ওপর।

—কি ভালো কথা বলছ না কেন?

খুব সহজ একটা সত্যি পথ ধরল দূর্বা। বেচারী মুখ করে বলল,

তুমি তো আর্টিস্ট, চোখে না দেখেও ভেতর বুঝে হাতে বেত তুলে দাও—এ-রকম জিগ্যেস করে মুশকিলে ফেলো কেন?

সঙ্গে সঙ্গে হাসির চোটে ছেলের মুখ লাল। এত হাসি দেখে হুইস্কিও মাথা তুলে মনিবকে লক্ষ্য করছে। দূর্বা তাড়াতাড়ি সামাল দিতে চাইল, বলল, তা'বলে একটুও খারাপ কথা বলেননি, তোমার জন্য সত্যি খুব চিন্তা, তাছাড়া আমি নতুন মানুষ··কিভাবে চলতে হবে না হবে তাতো বলবেনই।

হাসির মধ্যেই টুলটুলে মুখখানা বেঁকে গেল। কচি গলায় কড়া হুমকি, এঃ! তাহলে বড়দির হস্টেলে গিয়ে থাকো, এখানে থাকতে হবে না—কিভাবে চলতে হবে বড়দি বলে দেবে!

দূর্বার ভিতরে নাজেহাল দশা, বাইরে হাসছে। চোখে চোখ রেখে খুব চাপা গলায় রহস্যের মতো করে বলল, আমি এখানে সক্কলের কথা কানে শুনব, কিন্তু যা করার করব শুধু একজনের কথায়।

আবার হাসি।—বুঝেছি, আমার কথায়।

দূর্বা হাসি মুখে সায় দিয়ে মাথা নাড়ল। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য বলল, আজ কি আঁকা হলো দেখি—।

বিজু সোৎসাহে দেখাতে লাগল। দূর্বাও মন দিয়ে দেখল। ইস্কুলের ড্রইং মাস্টারের মুখে একসময়ের একটা শোনা গল্প সকালে আসার সময় মনে পড়েছিল। এখন সেটা মাথায় গিসগিস করছে। আঁকা দেখার পর লজ্জা-লজ্জা মুখ করে দূর্বা বলল, কাল আমি তোমাকে ঠিক বলিনি, আমিও কিন্তু বেশ আঁকতে পারি।

বিজুর খুশি ছোঁয়া অবাক মুখ।—এঁকে দেখাও তো একটা? আঁকার খাতাটা এগিয়ে দিল।

সেটা নিয়ে দূর্বা বলল, তোমার সামনে পারব না, তুমি তোমার খাটে বোসো, আগে উঁকি-টুকি দিয়ে কিচ্ছু দেখবে না কিন্তু—

বিজু তক্ষুণি বিছানায় গিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল। টেবিলে

ঝুঁকে রং-পেন্সিল নিয়ে দূর্বা প্রায় দশ মিনিট ধরে কি করল। বিজু উঠে বসে দেখে না ফেলে সেই ভয়ে খাতার পিছনে একটা হাতের আড়াল রেখেছে।

আঁকা শেষ হলো। ড্রইং খাতার পিছনটা বিজুর দিকে ধরে নিজের আঁকা মন দিয়ে দেখল দূর্বা। তারপর নিজেই বলল, সুন্দর হয়েছে।

বিজু তড়াক করে উঠে বসল।—দেখি?

দূর্বা খাতা উপুড় করে তাতে হাত চাপা দিয়ে বলল, কি আঁকলাম সেই বিষয়টা শোনো। যীশুর নাম শুনেছ তো?

—বা-ব্বা, বড়দি খৃশ্চান হয়েছে আর যীশুর নাম শুনিনি!

—বেশ। যীশুর অনেক ভক্ত ছিল। আর অনেক শত্রুও ছিল। একবার সেই শত্রুরা ভক্তদের আক্রমণ করতে এলো। কিন্তু ভক্তরা আগেই খবর পেয়ে গেল। তাদের প্রার্থনায় লোহিত সমুদ্র দু'ভাগ হয়ে গেল, আর ভক্তরা তার ভিতর দিয়ে পালাতেই সমুদ্র আবার জোড়া লেগে গেল।—এই বিষয়টাই এঁকেছি···বুঝলে?

গল্পটাই কান পেতে শোনার মতো। এই গল্প আঁকা তো সাঙ্ঘাতিক কথা! সাগ্রহে হাত বাড়ালো, শিগগীর দাও, দেখি—

—না, আমার হাত থেকে দেখো। দূর্বা খাতাটা এবার তার দিকে ফেরালো।

সেদিকে চেয়ে বিজু হাঁ একটু। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, তুমি এক নম্বরের মিথ্যেবাদী! গল্প বলে আমাকে এখন সাদা পাতা দেখাচ্ছ!

দূর্বার কাঁচুমাচু মুখ।—ঠিক হয়নি বলছ?

—ঘোড়ার ডিম হয়েছে! দুষ্টুমি করে একটা আঁচড়ও কাটোনি —না কি ভিতরে লুকিয়ে রেখেছ?

—না, এইটেই। তুমি ভালো করে দেখো, খুব খারাপ হয়নি।

বিজু একটু রেগেই গেল।—সব তো সাদা, কি দেখব?

ব্যস্ত হয়ে দূর্বা বলল, আচ্ছা, কি পাচ্ছ না আমাকে জিগ্যেস করো, আমি বলে দিচ্ছি।

কিছু মজার খেলা হতে পারে ভেবে বিজু থমকালো একটু। জিগ্যেস করল, দু'ভাগ হওয়া আর জুড়ে যাওয়া লোহিত সমুদ্র কোথায় ?

দূর্বা জবাব দিল, তুমি ম্যাপ দেখলেই বুঝতে পারবে, সেই অত-শ' বছর আগের লোহিত সমুদ্র এখন কত দূরে সরে গেছে। তাহলে এখানে তুমি সেটা পাবে কি করে ?

এবারে একটু মজার গন্ধ পেল বিজু। আবার জিগ্যেস করল, যীশুর সেই ভক্তরা কোথায় ?

—বা-রে! তারা তো পালিয়েই গেছে, তাদেরই বা দেখবে কি করে ?

এবারে বিজুর বড় বড় চোখ!—আর যে শত্রুরা আক্রমণ করতে আসছে ?

মুখ কাঁচুমাচু করে দূর্বা বলল, তারা তো এখনো এসে পৌঁছয়নি···।

বিজু তাব মুখের দিকে থমকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর হাসির চোটে বিছানায় গড়াগড়ি। মুখ রক্তবর্ণ, চোখে জল এসে গেল। তবু হাসি আর থামেই না। দূর্বা তাড়াতাড়ি উঠে এসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগল।—এই এই! এত হাসে না—থামো থামো এবার।

দরজায় চোখ পড়তেই দূর্বা আরো বিব্রত। ট্রেতে কিছু খাবার আবার চা-টা নিয়ে সুমতি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। এত হাসি দেখে সে-ও হতভম্ব।

চোখ মুছতে মুছতে বিজু উঠে বসল। সুমতি ট্রে-টা টেবিলের ওপর রাখল। কৈফিয়তের সুরে দূর্বা বলল, এত হাসবে ভাবিনি··· ওর তাতে ক্ষতি হবে না তো ?

একগাল হেসে সুমতি বলল, হাসা তো খুব ভালো. এক রণ এলে যা একটু হাসে, নইলে তো হাসেই না।

ট্রের ডিশে কিছু খাবার আর চায়ের পেয়ালার পাশে আধ গেলাস দুধ দেখেই বিজুর মেজাজ সপ্তমে চড়ল। চেঁচিয়ে উঠল, দুধ কে আনতে বলেছে? শিগগীর নিয়ে যাও বলছি, নইলে গেলাসসুদ্ধু ছুঁড়ে ফেলে দেব! সকালে এক-কাঁড়ি খাইয়ে সাধ মিটল না?

সুমতি হালছাড়া চোখে দূর্বার দিকে তাকালো। দূর্বা বলল, ঠিক আছে, আমিই খেয়ে নেব'খন সুমতিমাসি।

সুমতি খুশিমুখে পালালো। বিজুর সন্দিগ্ধ চোখ দূর্বার মুখের ওপর।—দেখো, কাল বলেছ—খেয়েছি। আজও ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়াবার মতলব—কেমন? এই করলে আমার সঙ্গে ওই নার্সদের মতো ঝগড়া হয়ে যাবে!

দূর্বা খুব নরম করে বলল, তুমি এত বড় ছেলে তোমাকে ভুলিয়ে খাওয়াবো কি করে? কিন্তু সাতটা দিন অন্তত আমার কাছে একটু না খেলে আমি তোমার কাছে থাকতে পার কি করে? সাতটা দিন আমার পরীক্ষা না?

—সাত দিন কি পরীক্ষা?

—এই সব পরীক্ষা···এতে পাশ করলে তবে তো আমি পাকা-পাকি ভাবে তোমার কাছে থাকতে পাব!

—কে বলেছে? মা?

দূর্বা এবারে বিপন্ন একটু।—বলবেন না কেন, কতটা পারি না পারি আগে দেখে নেবেন না?

কথা শেষ হবার আগেই বিজু খাটে লাগানো বোতামটা টিপে ধরল, আর ধরেই থাকল। বাইরে একটানা প্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ আওয়াজ। দূর্বা গতকালই ওটা লক্ষ্য করেছে—কলিং বেল। এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি ওর হাত টেনে নিল।—এ কি করছ? কি চাই?

জবাব পাওয়ার আগে একটা চাকর আর সুমতি ছুটে এসেছে। বিজু সেদিকে চেয়ে চেঁচিয়ে হুকুম করল, মা-কে—শিগগীর!

দূর্বার ত্রাস।—মা-কে কেন? কি বলবে?

জবাব না দিয়ে বিজু রাগত মুখে দরজার দিকে চেয়ে আছে। দূর্বার আর কিছু বলার ফুরসৎ মিলল না। নির্মলা সরকারও প্রায় ছুটে এসেছেন। পিছনে বড় মেয়ে কমলা। তার পিছনে সুমতি।

—কি রে বিজু? কি হয়েছে?

—দূর্বা দিদিকে তুমি কি বলেছ?

সঠিক না বুঝে মহিলা দূর্বার দিকে তাকালেন। মনে মনে দূর্বা সত্যি প্রমাদ গুণছে।

মা ছেলের দিকে ফিরলেন।—কেন? কি বলেছি?

—কি বলেছ? দূর্বাদি যে বলল, সাত দিন অন্তত আমি তার কাছে একটু না খেলে পরীক্ষায় পাশ করবে না, আর আমার কাছে তাহলে থাকতেও পাবে না?

নির্মলা সরকার ধরেই নিলেন ছেলেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টায় ওই রকম বলেছে। হাসি চেপে নিরীহ মুখ করে দূর্বা যা বলেছিল তা-ই বললেন।—কি-রকম পারে না পারে একটু দেখে নেব না?

বিজুর ক্রুদ্ধ দু'চোখ দূর্বার দিকে ফিরল।—দুধের গেলাসটা দাও তো!

দূর্বা শশব্যস্তে দুধের গেলাস তুলে নিয়ে তার মুখের সামনে ধরল। চোঁ-চোঁ টানে এক নিঃশ্বাসে আধ গেলাস দুধ খালি। বড় করে দম ফেলল একটা। তারপর চেঁচিয়ে সুমতিকে হুকুম করল, ও-রকম আরো দু'-গেলাস দুধ নিয়ে এসো এক্ষুণি! এক দিনেই সাত গেলাস খেয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি পাশ কি ফেল—দাঁড়িয়ে আছ কেন? শিগগীর নিয়ে এসো!

এবারে মা ব্যতিব্যস্ত। না-না—পাশ—খুব ভালো পাশ! এখন আর তোকে দুধ খেতে হবে না। তাড়াতাড়ি দূর্বার কাছে এগিয়ে এলো, আর তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে না, গতকাল থেকেই তুমি একদম পাকা—বুঝলে?

দূর্বারও ততোক্ষণে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে। ভালো মুখ করে মাথা নাড়ল, বুঝেছে।

এরই মধ্যে ছন্দ পতন ঘটিয়ে বসল কমলা সরকার। এতক্ষণ গম্ভীর ছিল। শুনছিল আর দেখছিল। এখন আবো গম্ভীর গলায় ভাইকে বলল, ইচ্ছে কবলেই তো বেশ খেতে পাবিস—অত মবজি করিস কেন?

আর যায় কোথায়। রাগে সুন্দর মুখটা একেবারে বিকৃত করে বলাব ঢং নকল করে ভেঙচে উঠল, ইচ্ছে কেল্লেই তো খেতে পারিস—যাও এখান থেকে—যাও বলছি! ওঁর স্কুলের মেয়ে পেয়েছে আমাকে!

দূর্বা অবাক হয়ে দেখল অমন গুরুগম্ভীর বড়দি-টি সুড়সুড় করে ঘব ছেড়ে চলে গেল। অসহায় মুখ করে নির্মলা সরকাব দূর্বাকেই সাক্ষি মানলেন।—অতবড দিদির সঙ্গে কি রকম করে কথা বলে দেখলে?

ছেলে মায়েব ওপরেও খেঁকিয়ে উঠল।—অত বড় দিদি আমার সঙ্গে লাগতে আসে কেন? ছ'দিনেব জন্যে এসেও মাস্টারি করা চাই!

—আচ্ছা থাম এবাব, অনেক চেঁচিয়েছিস, এরপর শরীর খারাপ হবে। তিনিও ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

বিজুর দিকে চেয়ে এবারে দূর্বাও ব্যস্ত একটু। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মুখও ফ্যাকাশে। বিছানায় শুয়ে পড়ে চোখ বুজল। দূর্বা খাটের ওপরেই তার পাশে বসল। মাথার পাতলা চুলে আঙুল ডুবিয়ে ওপর দিকে তুলে দিতে লাগল।—খারাপ লাগছে না তো বিজু?

বিজু মাথা নাড়ল। খারাপ লাগছে না। চোখ মেলে দূর্বাব দিকে তাকালো। ঝপ করে বলে বসল, এক রণদা ছাড়া আসলে এরা কেউ আমাকে ভালোবাসে না—বুঝলে?

এমন সুরে বলল যে দূর্বার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল। কি-ধরনের ভালোবাসার কাঙাল এই ছেলে তা-ও ঠাওর করে উঠতে

পারল না। ঝুঁকে মাথায় আরো ভালো করে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, মা-কি কখনো তার ছেলেকে ভালো না বেসে পারে?

প্রতিবাদ না করে বিজু আবার চোখ বুজল।

ঘড়ি ধরে ঠিক একটায় বিজুর লাঞ্চের টাইম। সুমতি ছাড়া অন্য সকলেরও তাই, বোঝা গেল। একজন চাকর একটার ছু'মিনিট আগে এই ঘরে একটা ভাঁজকরা টেবিল এনে পেতে রেখে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থালায় ভাত আর কাচের কয়েকটা সাজানো বাটি হাতে সুমতি এলো। দূর্বাকে বলল, সকলে খেতে গেছে, দিদি তোমাকেও ডাইনিং রুমে যেতে বললেন। আমি ওকে খাইয়ে দিচ্ছি।

দূর্বা ফাঁপরে পড়ল। ডাইনিং রুম ওপরে কি নিচে তাই জানে না। সকলে বলতে আর কে-কে গেছে আঁচ করতে পারে। বিজুর সঙ্গে গল্প করে এর মধ্যে কিছু খবর সংগ্রহ করেছে। বাড়ির কর্তা নিখিলেশ সরকার রোজ সকাল ন'টার মধ্যে বেরিয়ে যান। আপিসে লাঞ্চ করেন। রাত আটটার পরে ফেরেন। আপিস থেকে যেদিন ক্লাবে চলে যান, ফিরতে রাত দশটা সাড়ে দশটাও হয়ে যায়। বিজুর ছোড়দি রমলা গতকাল আসানসোলে কোন ফাংশানে নাচতে গেছে। আজ সন্ধ্যার আগে ফিরবে না। অতএব খাবার ঘরে সে নেই। মিসেস সরকার আর বড় মেয়ে তো আছেই। বাড়ির যে বড়দাটিকে এখনো দেখেনি, তার থাকাই সম্ভব।

আমতা আমতা করে দূর্বা সুমতিকে বলল, আমি যদি একটু পরে আপনার সঙ্গে যাই সুমতি মাসি, খুব অসুবিধে হবে···ওর হয়ে গেলে তারপর খেতাম।

সে কিছু বলার আগেই বিজু হুকুম করল, দূর্বাদির খাবারটাও এখানে দিয়ে যেতে বলো।

—না-না না-না! দূর্বা ব্যস্ত হয়ে উঠল, এখানে আনতে হবে না, আমি পরে খেয়ে নেব।

বিজুর খাবারটা রেখে আবার বাইরে যেতে যেতে সুমতি চোখের ইশারা করল। দূর্বা বাইরে আসতে হাসিমুখে ফিসফিস করে বলল, দিদি শুনলে খুশি হবেন—আপত্তি কোরো না।

বলল বটে। কিন্তু দূর্বার সংকোচ একেবারে গেল না। বাড়ির কর্তা সাহেব হলেও কর্ত্রীটি তার দিদি বোঝা গেল। ঘরে ফিরতেই বিজু চোখ পাকিয়ে জিগ্যেস করল, বাইরে ডেকে নিয়ে সুমতিমাসি কি বলছিল?

ছেলেব চোখে কিছুই এড়ায় না। ঢোঁক গিলে দূর্বা বলল, তোমার কথার অবাধ্য হতে বারণ করল।

বিজুর পরিতুষ্ট মুখ। একটু বাদে সুমতি ফিবল। তার হাতে ট্যাবলেটের শিশি। আব এক প্রস্থ খাবার নিয়ে পবিষ্কার পা-জামা হাফশার্ট আর চপ্পল পরা বাবুর্চি ঘরে ঢুকল। চেহারাপত্র দেখে হিন্দুই মনে হলো দূর্বার।

বিজুর ফোলডিং ডাইনিং টেবিল একেবারে ছোট নয়। সুমতির ইশারায় বিজুব খাবারের পাশেই দূর্বার খাবার রেখে গেল। জলের সঙ্গে ট্যাবলেট গলায় ফেলে বিজু খেতে বসল। তবে খাবারের ঢাকনা খোলা হতে কি খায় দূর্বা লক্ষ্য করল। সুপ, ভাত-ডাল, কিছু ভাজা, বড় এক টুকরো ভালো মাছ, মাংসের স্টু, একটু দই, একটা মিষ্টি।

—বসে যাও। ওই একটা চেয়ার টেনে নাও। কোলের ওপর বিজু নিজের ন্যাপকিন পেতে নিল।

এবারে অনুনয়ের সুরে দূর্বা বলল, তোমার সব কথা শুনেছি, আমার একটা কথা কিন্তু রাখতে হবে। তোমার খাওয়া হয়ে গেলে তারপর আমি খাব। তোমার খাওয়া দেখতে না পেলে আমার বিচ্ছিরি লাগবে।

—খেতে খেতে দেখো।

—হ্যাঁ খেতে খেতে দেখি আর গলায় মাছের কাঁটা ফুটুক। লক্ষ্মীটি তুমি খাও। তোমার হয়ে গেলেই তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে আমি খেয়ে নেব।

বিজু বিরক্ত হতে গিয়েও হেসে ফেলল।—তুমি এক নম্বরের দুষ্টু, আসলে আগে আমাকে খাইয়ে পরে নিজে খাবে!

নিজের হাতে ফেলে ছড়িয়ে খেতে শুরু করে দিল। তিন চামচ সুপ মুখে দিয়ে বাটি সরালো। তারপর ঠুকরে ঠুকরে এটা এটা খেতে লাগল। তাও বেশ তাড়াতাড়ি।

—ও কি, আস্তে আস্তে ভালো করে খাও, অত তাড়া কিসের?

সুমতি বলল, এই রকমই খায়, খাওয়ার সময় যত ব্যস্ততা।

বিজু বলল, দেরি করে কি হবে, খাওয়া হলেই তো হজমের ওষুধ গেলাবে।

দূর্বা নিঃশব্দে উঠে অ্যাটাচড বাথ-এ ঢুকে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে তার মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসল। বিজু সঙ্গে সঙ্গে মতলব বুঝল। তপ্ত গলায় বলে উঠল, আমার খাবারে হাত দিলে আমি আর খাবই না—এতবড় ছেলেকে তুমি খাইয়ে দেবে?

দূর্বাও সমান ওজনের জবাব দিয়ে বসল, এতবড় ছেলে এমন অবুঝ হলে কি করব?

—আঃ! আমার এর থেকে বেশি খেতে ভালো লাগে না!

দূর্বা ক্ষুব্ধ মুখে চেয়ে রইল একটু। তার পর সুমতিকে বলল, আমার খাবারটা নিয়ে যেতে বলুন মাসি—এখানে যা আছে আমার তাতেই হয়ে যাবে।

বিজুর ঠোঁটে দুষ্টু হাসি।—হুঁঃ, চালাকি বুঝি না, আমার পাতেরটা তুমি খেতে যাবে—

জবাবে দূর্বা তার থালা থেকে একটা ভাজা তুলে নিয়ে নিজের মুখে দিল। বিজু বড় বড় চোখ করে দেখল এবার। পরে হাল-ছাড়া গলায় বলল, তুমি খুব বিরক্ত করো, জোর করে বেশি খাওয়ালে আমার অসুবিধে হয় কেউ বোঝে না—ঠিক আছে, ওই দই আর মিষ্টি তুমি চামচে করে খাইয়ে দাও।

আর পীড়াপীড়ি না করে দূর্বা তাই করল। সুমতি মাসির মুখ দেখে মনে হলো যেটুকু খাওয়া হলো আজ, খুব যথেষ্ট।

ওর থালা বাসন তুলে নিয়ে চলে গেল। দূর্বা খেতে বসল। সকলের সঙ্গে বসে খাওয়ার ঝামেলা থেকে বিজু বাঁচিয়েছে। ঢাকনা তুলে তুলে দেখল তারও একই রকমের খাওয়া। কেবল স্টুর বদলে বেশ পাকানো মাংস। এত সব দেখে দূর্বার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। শেফালিটা খেতে এত ভালবাসে···নিজে রান্না করে কি খেয়েছে কে জানে। দূর্বা চুপচাপ খেতে লাগল।

বিজু শুয়ে শুয়ে চুপচাপ তাকেই দেখছিল। হঠাৎ জিগ্যেস করল, তোমার দূর্বা নাম কে রেখেছে ?

—ঠিক জানি না, মা বোধহয়···কেন ?

—খুব সুন্দর নাম, পুজোয় লাগে।

মন্তব্যটুকু কানে বেশ লাগল দূর্বার। হেসেই বলল, গোরু ছাগলেও খায়, মানুষে মাড়িয়ে যায়।

একটু চুপ করে থেকে বিজু আবার বলল, তা হলেও দূর্বা শুনলে পুজোয় লাগাটাই আরো মনে আসে।

দূর্বা খাওয়া ফেলে থমকে তাকালো। মনে হলো, এই ষোল বছরের ছেলের মধ্যেও এমন স্বচ্ছ কিছু আছে যার বিচার বয়েস দিয়ে হয় না। এ-রকম বলে দূর্বা যেন এই স্বচ্ছতার ওপর কালো দাগ ফেলতে যাচ্ছিল।

গল্পে গল্পে দুপুরটা ভালো কেটে গেল। একটা জিনিস দূর্বা লক্ষ্য করেছে। মাঝে মাঝে ছেলেটা নিজেই বিছানায় শুয়ে পড়ে। চোখ বুজে খানিক বিশ্রাম নেয়। হয়তো ঝিমুনিও আসে একটু। তারপর আবার তরতাজা হয়ে উঠে বসে। আগ্রহ দেখে প্রথম দিনেই দূর্বাকে একটু আঁকা শেখাতেও চেষ্টা করেছে। আর চোখ বুজে শুয়ে দু'টো খুব সুন্দর গল্প শুনেছে। ওরই ইংরেজি বইয়ের গল্প যে, জানে না।

সন্ধ্যাও পেরুলো। এতক্ষণের মধ্যে বিকেলে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নির্মলা সরকার একবার এসেছিলেন। সুমতি বার দুই তিন এসেছে। বিকেলের হাল্কা খাওয়া খাইয়ে দিয়ে গেছে। দূর্বাকে চা বিস্কুট দিয়েছে। বড়দি কমলা সরকার আর এ ঘরে ঢোকেনি।

সন্ধ্যে সাতটা। দূর্বার এখানে থাকার মেয়াদ আর এক ঘণ্টা। বাড়ির কর্ত্রী তার মধ্যে না ফিরলে তার যাওয়া হবে কিনা জানে না। বিজুর মুখে শুনেছে, উনি তাঁর ক্লাবে গেলেন। মেয়েদের ক্লাবে তার মা নাকি প্রেসিডেন্ট। অনেক কাজ থাকে। রোজ একবার যেতেই হয়। বেশি কাজ পড়লে দু'বেলাই যেতে হয়। অবশ্য বিজুর শরীর ভালো না থাকলে কম বেরোন। গেলেও বেশি সময় থাকেন না।

যত বড় লোকই হোক, যাঁর ছেলের এমন রোগ তাঁর ক্লাব করাটা কি রকম লাগল দূর্বার। তবে ক'টা বড়লোকই বা আর দেখেছে।

বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। দরজার সামনে একজন অদেখা মানুষ দাঁড়িয়ে। বিজু অন্য দিকে ফিরে হুইস্কির সঙ্গে খুনসুটি করছে। দরজায় যে দাঁড়িয়ে সে দূর্বার দিকেই চেয়ে আছে। পরনে পা-জামা পাঞ্জাবি, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। ব্যাক-ব্রাশ করা পাতলা চুল—কপালের দু'দিকে খানিকটা করে টাক। বছর আটত্রিশ উনচল্লিশ হবে বয়েস। মার্জিত চেহারা, চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ।

আগে না দেখেও দূর্বা চিনল। এ-বাড়ির বড়দা অঞ্জন সরকার।

দরজার দিকে চেয়ে হুইস্কি সরবে আনন্দ প্রকাশ করতে বিজু ঘুরে তাকালো। তারপর সে-ও খুশি।—বড়দা এসো, বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? দুদিনের মধ্যে তো দূর্বাদির সঙ্গে দেখাই হলো না তোমার—দূর্বাদি খুব ভালো বড়দা—

এটুকুর মধ্যেই দূর্বা লক্ষ্য করল, বড়দির সঙ্গে যে-রকম আচরণ ছেলেটার, বড়দাটির সঙ্গে সে-রকম নয়। সত্যিই বেশ খুশি ও। দূর্বা দু'হাত তুলে নমস্কার জানালো। ভদ্রলোকের হাত দুটো পাঞ্জাবির দুই পকেটে। মাথা নেড়ে প্রতি নমস্কার জানিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। ঠোঁটে মৃদু হাসি। ভাইকে বলল, তোর খুব পছন্দ হয়েছে মায়ের কাছে শুনেছি। কেমন আছিস আজ ?

—আজ খুব ভালো আছি বড়দা। সকালে নিজের আঁকা দূর্বাদি যা একখানা ছবি দেখালো না ! মনে পড়তেই হেসে অস্থির।

ভাইকে অত হাসতে দেখেই অঞ্জন সরকারও খুশি একটু।—আপনি আর্টিস্ট ?

বয়সে অত বড় হলেও কমলা সরকারের মতো হুট্ করে তুমি বলল না। রীতিমতো লজ্জা পেয়ে দূর্বা বলল, আমি আঁকার কিছুই জানি না।

দুষ্টুমি করে বিজু বলে উঠল, দারুণ আর্টিস্ট বড়দা—দেখবে ?

হাসি মুখেই বড়দা বলল, আচ্ছা এখন থাক, পরে দেখা যাবে। যে-জন্যে এলাম শোন—রণ ফোন করেছিল, কাগজের কাজে পাঁচ ছ'দিনের জন্য আজই বাইরে চলে যাচ্ছে। তুই কেমন আছিস জিগ্যেস করল, আর ফিরে এসেই তোর সঙ্গে দেখা করবে বলল।

শুনে রাগে গরগর করে বিজু বলল, কেন যাবার আগে একবার দেখা করে যেতে কি হয়েছিল—দূর্বাদির কথা শুনেছে ?

—এখন বললাম।

—তুমি আর কি জানো যে বলবে—এই তো সবে দেখলে।

অর্থাৎ রণদাকে পেলে সে কত কথা বলত ঠিক নেই। জবাবে অঞ্জন সরকার হাসল একটু। দূর্বার দিকে ফিরল।—ফাঁক পেলে একবার ওপরে আসবেন, দরকার আছে।

চলে গেল। দূর্বা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল একটু। হঠাৎ ওপরে ডাকার মতো কি দরকার পড়তে পারে ভেবে পেল

না। ঘড়ি দেখল। সাতটা দশ। একটু অস্বস্তির মধ্যেই পড়ে গেল।...দাদু বলেছিল, অন্য ছেলেমেয়েগুলোর মতিগতির ঠিক নেই। গতকাল এই বিজু বলেছিল, কুকুরের হুইস্কি নাম বড়দার দেওয়া—কারণ তার আবার ও-সব জিনিস বেশ চলে। সশঙ্কে বিজুর দিকেই তাকালো। কিন্তু বিজুর নির্লিপ্ত মুখ।—বড়দা ডাকল যে, যাচ্ছ না কেন? শুনে এসো। সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে গেলে শেষের দিকে বড়দার ঘর।

এমন করে বলল, যেন ও-বাড়ির বড়দা ডাকলে কারো একটুও দেরি করা চলে না। দূর্বা অগত্যা বেরিয়ে এলো। দোতলার বারান্দাটা ফাঁকা। পায়ে পায়ে তিনতলায় উঠলো। তাও ফাঁকা। বারান্দার শেষে মস্ত মস্ত দুটো ঘরে আলো জ্বলছে।

নিরুপায় দূর্বা এগিয়ে চলল। সামনের ঘরের দরজা ভেজানো। পরেরটা খোলা। আস্তে আস্তে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। যে দৃশ্য চোখে পড়ল, বুকের তলায় টিপটিপ।

ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে চটি মতো একটা বই পড়ছে অঞ্জন সরকার। পাশের টেবিলে আধ-খাওয়া মদের গেলাস। টেবিলের পায়ার ফাঁক দিয়ে হুইস্কির বোতল আর সোডার বোতল দেখা যাচ্ছে। দূর্বা নিঃশব্দে আবার চলে যাবে কিনা সেই দ্বিধা।

—আসুন। হাতের বই খোলা অবস্থাতেই উপুড় করে গেলাসের পাশে রাখল।

একটা বিচ্ছিরি অস্বস্তি চেপে দূর্বা ভিতরে এলো। পাঁচ সাত হাত তফাতের একটা চেয়ার দেখিয়ে তাকে বসতে বলা হলো। বসল। বড় সড় লাইব্রেরি ঘর এটা। বড় বড় কাঁচের আলমারি ঠাসা মোটা মোটা বই। পাতলা চটি বইয়ের ছোট আলমারিও দেখল একটা। সাময়িক বিশ্রামের মতো অদূরে একটা ছোট শয্যাও পাতা আছে।

একলা তিনতলায় ডেকে আনাটা বা টেবিলে মদের গেলাস দেখে প্রতিক্রিয়া কি হতে পাবে এ-সব যেন খেয়ালের মধ্যেই এলো

না মানুষটার। জিগ্যেস করল, আপনার এ-ধরনের কাজের কিছু এক্সপিরিয়েন্স আছে ?

দূর্বা মাথা নাড়ল। নেই।

—নার্সিং এক্সপিরিয়েন্সের খুব দরকার নেই অবশ্য, হি নিডস এ কমপেনিয়ন। মায়ের কাছে যা শুনলাম, ভালই পারবেন মনে হয়। তাহলেও কিছু ব্যাপার আপনার জানা থাকা দরকার। কি কেস্ জানেন তো ?

দূর্বা একবার ভাবল বয়সে পনের যোল বছরের বড় লোকটাকে তুমি করে বলতে বলে। বলা গেল না। মৃদু জবাব দিল, দাদুর কাছে শুনেছি।

—দাদু কে ?

নাম বলল।

—ও ··! অবাক একটু।—আপনার নিজের দাদু ?

মাথা নেড়ে সহজ হতে চেষ্টা করল।—নিজের থেকেও বেশি হয়ে গেছেন।

—এ-রোগের ভবিষ্যত কি তাও জানা আছে তাহলে ?

—দাদু বলছিলেন আট দশ বছর টিকে থাকতে পারলে তার মধ্যে ওষুধ বেরিয়ে যেতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত অসহিষ্ণু গোছের হাসি একটু।—লেট্স হোপ্ সো। কিন্তু উনি কিছু জানেন না। মাঝ বয়েসের ক্রনিক মাইলয়েড লিউকিমিয়া হলে বহুকাল টিকিয়ে রাখা যায়। এ-বয়েসের ছেলেদের যেটা সেটা অ্যাকিউট লিউকিমিয়া। ছ'মাস থেকে এক বছরের বেশি বড় একটা টিকিয়ে রাখা যায় না। তবে সে-রকম বরাত থাকলে বা হালের চিকিৎসাপত্র করতে পারলে দু'চারটে কেস চার পাঁচ বছরও টিকে যায়—বিজুর প্রায় দু'বছর তো হয়ে গেল, আশা করা যায় আমাদেরও সে-রকম বরাত হতে পারে।

যে-ভাবে বলে গেল, এ-সব যেন জল-ভাতের মতো জানা

ব্যাপার তার কাছে। মদের গেলাসের কথা আর মনে নেই। আশংকাটাই ভেতর ছেয়ে ফেলল।

—যাক্, আপনার কি করণীয় শুনুন। রোজ ওকে আর ওর সমস্ত গা খুব ভালো করে ওয়াশ্ করবেন। খুব বেশি ক্লান্তি দেখলে বা বার বার ঝিমিয়ে পড়ছে দেখলে তক্ষুণি আমাকে খবর দেবেন। আমি দু'পাঁচ দিনের জন্য মাঝে মাঝে বেরিয়ে যাই, না থাকলে তক্ষুণি রণর অফিসে ফোন করবেন। তাকে না পেলে যেমন করে হোক মেসেজ দিতে বলবেন। রণ বা আমি দু'জনে একসঙ্গে কলকাতার বাইরে যাই না, একজন না একজন এই জন্যেই থাকি। বাই চান্স একজনকেও না পেলে প্রথমেই মেট্রন বিশাখা ব্যানার্জীকে ফোনে খবর দেবেন। সুমতির কাছ থেকে রণ আর বিশাখার কাগজ আর হাসপাতালের অ্যাড্রেস ফোন নম্বর সব লিখে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবেন। তার থেকেও ইম্পবট্যাণ্ট, জ্বর হলে বা শরীরেব কোথাও হাড়টাড় ব্যথা শুনলে, কোনো গ্ল্যাণ্ড ফোলা দেখলে বা নাক অথবা মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়তে দেখলেই যা বললাম তাই করবেন। হাড়ে বা বুকের মাঝখানেও ব্যথা হতে পারে, চামড়াব তলায় হঠাৎ কিছু জমাট রক্তও দেখতে পারেন—এ-সবের যা-ই দেখুন, একটুও সময় নষ্ট করবেন না। এ-সবের জন্যেই আগে নার্স রাখা হয়েছিল, কিন্তু একটু লক্ষ্য রাখলে সকলেরই বুঝতে পারার কথা। যা বললাম মনে থাকবে ?

অজানা ভয়ে বুকের তলায় আবার দুরুদুরু করে উঠল দূর্বার। ভদ্রলোক ওকে ইচ্ছে করে বেশি ভয় পাইয়ে দিচ্ছে কিনা বুঝছে না। মাথা নাড়ল। মনে থাকবে।

—ঠিক আছে, আপনি ওর কাছে যান। ওর ওষুধপত্র কি চলছে সুমতির কাছ থেকে বুঝে নেবেন।

চলে এলো। কিন্তু অবাক হবার মতো এই সন্ধ্যায় পর-পর আরো কিছু মজুত ছিল। দোতলায় নেমেই দেখে কমলা সরকার

বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সেই একই রকম টান ধরা মুখ। ওকে তিনতলা থেকে নামতে দেখে ওই মুখে একটা রেখাও পড়ল না। শুধু চেয়েই রইল।

কৈফিয়ত দেবার সুরে দূর্বা নিজের থেকেই বলল, বিজুর কখন কি সিমটম দেখলে কি করতে হবে বুঝিয়ে দেবার জন্য বড়দা ডেকেছিলেন···।

রুক্ষ গম্ভীর মুখের ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির আঁচড় পড়ল কি পড়ল না। বলল, বিজুর কাছে বিশাখা ব্যানার্জী এসেছে।···চেনো?

হাসপাতালের মেট্রন বিশাখা ব্যানার্জীর নামটা এইমাত্র শুনে এসেছে মনে পড়ল। কিন্তু এই মহিলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেশি কথা বলাও মুশকিল। মাথা নেড়ে দিয়ে জবাব সারল। চেনে না।

—যাও, বিজুই চিনিয়ে দেবে'খন।

অন্যদিকে চলে গেল। বিছানায় যে মহিলা বিজুকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে হাসি মুখে তার কথা শুনছে আর মাথা নাড়ছে, এই বেশে তাকে দেখলে মেট্রন-টেট্রন কিছু মনে হয় না। বছর বত্রিশ বয়েস, গায়ের রং কালোই বলা চলে, কিন্তু বেশ সুশ্রী। আর দিব্বি আঁট স্বাস্থ্য।

দূর্বা ঘরে পা দিতেই হেসে বলল, এসো, এতক্ষণ তোমার গল্প শুনে আমার হিংসেই হচ্ছিল। এই দেড় দিনের মধ্যে আমার কাছ থেকে তুমি ওর মন কেড়ে নিয়েছ।

বিজু পরিচয় করিয়ে দিল, এই হলো আমার বড় বউদি, শনিবারে শনিবারে আমাকে দেখতে আসে, শরীর খারাপ হলেও আসে—বড় বউদির কথা কাল তোমাকে বলেছি না?

দূর্বা হতভম্ব কয়েক মুহূর্ত। সঙ্গে সঙ্গে সহজ হবার ধকল। দু'হাত জুড়ে কপালের দিকে তুলল। সেদিকে না চেয়ে মহিলা বিজুর দিকেই ফিরল। মেকি কড়া গলায় বলল, আমার কথা কি বলা হয়েছে শুনি?

বিজুও তক্ষুণি জবাব দিল, সব বলা হয়েছে—বেশ করব বলব—ঝগড়া করে ছাড়াছাড়ি হয়েছে তো হয়েছে—আবার ভাব করে নিতে পারো না ?

—এবারে আমি তোর কানে হাত দেব—অভাব কোথায় দেখলি ?

—অভাব কোথায় দেখলি। আমি বাচ্চা ছেলে, কিছু বুঝি না।

দূর্বা অস্বস্তি বোধ করছে, কিন্তু মহিলা দিব্বি হাসছে। ওকে বলল, বাড়িসুদ্ধু লোককে ও শাসনে রাখে বুঝলে—তুমিও টেরটি পাবে। তবে বিজুবাবু সত্যি খুব ভালো ছেলে।·· অজু কি করছে দেখলে ?

দূর্বা থতমত খেল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলও। মনে মনে বলল, বা-ব্বা, আধুনিকা বটে।—বই পড়ছেন।

মহিলার মুখে চাপা হাসি খেলে।—কি বই তুমি আবার চেয়ে নিয়ে দেখনি তো ?

দূর্বা বোকার মতো মাথা নাড়ল। হাতে অবশ্য চটি বই ছিল, কিন্তু আলমারি বোঝাই মোটামোটা বাঁধানো বই দেখেছে।

নিজের হাতঘড়ি দেখে বিশাখা উঠল। দূর্বাকে বলল,—আচ্ছা, আজ চলি, পরে আরো গল্প হবে।

পিছন থেকে বিজু হুকুম করল, বড়দার সঙ্গে দেখা করে যাও।

ঘুরে বিশাখা ব্যানার্জী হাসিমুখে দু'জনের দিকেই তাকালো একবার। তারপর বিজুর কথায় মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সব থেকে বড় ধাক্কা মিনিট তিনেকের মধ্যেই। ঘড়িতে পৌনে আটটা প্রায়। বিজু বলছিল, দুধ পাঁউরুটি আর একটু মিষ্টি খেয়ে তারপর ওষ্ধ খেয়েই সে আটটার মধ্যে শুয়ে পড়ে। আর দু' মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ে। তাই ওষুধ খাওয়া হলেই তার ছুটি। দূর্বার ধারণা, রাতের এটা সিডেটিভ কিছু হবে। কাল ওষুধ টষুধ-গুলো সুমতির কাছ থেকে বুঝে নেবে। সুমতি ওর খাবারের জোগাড়ে

গেছে। চটির ফটফট শব্দে জানান দিয়ে ঘরে ঢুকল একজন। তাকে দেখেই দূর্বার এই ধাক্কা।

—কি রে বি-চ্ছু, কেমন আছিস? খাটের ও-দিকে আর কে আছে খেয়ালও করল না। দূর্বা মশারিটা ফেলে গুঁজে দিচ্ছিল। মশারির ও-ধারে থাকাতে নজরে পড়েনি।

—বিচ্ছু বলায় বিজুও ভেঙচে ভেঙচে জবাব দিল, খুব ভালো আছি নাচন-দি, তুমি একটা দিন ছিলে না, কান ঠাণ্ডা ছিল।

—এই! নাচনদি চোখ পাকালো।—দেব ধরে থাপ্পড়!

—দাও দেখি কত সাহস? নাচ দেখে সবাই ছ্যা-ছ্যা করেছে তো?

—সব মূর্ছা গেছে, বুঝলি হাঁদা—একটা মেডেল পর্যন্ত পেয়েছি, দেখবি?

—এখন আমি খেয়ে ঘুমুবো, তুমি মেডেল ধুয়ে জল খাওগে যাও!

—ফের?

—ফের!

দূর্বা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখা-মাত্র বিজুর ছোড়দি রমলা সরকারও হাঁ একেবারে।—তুমি…ইয়ে দূর্বা বোস না?

দূর্বা নিজেও বিস্ময়ের ধকল ভালো করে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বিজুর ছোড়দি এই রমলা হতে পারে ভাবেনি। হাসতে চেষ্টা করে বলল, সেই রকমই তো জানি…।

রমলার তখনো আকাশ থেকে পড়া মুখ।—তুই এখানে বিজুর ঘরে মশারি টাঙাচ্ছিস কি ব্যাপার?

রহস্যের ব্যাপার কিছু ঘটেছে আঁচ করে বিজু বলল, দূর্বাদি তো কালকেও এসেছিল, তুমি নেচে নেচে বাড়ি মাথায় করছিলে জানবে কি করে!

—তুই থাম ছোঁড়া! দূর্বার দিকেই ফিরল আবার। —তুই এখানে বিজুর কাজে লেগেছিস নাকি?

কথার মধ্যে রুচির বালাই নেই। ঠাণ্ডা মুখে দূর্বা জবাব দিল, হ্যাঁ।

—বলিস কি রে! একই সঙ্গে খুশি যতো বিস্ময় ততো। —তোর অতসব নাগর থাকতে শেষে কিনা—

মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। ওদিক থেকে সুমতি বিজুর খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। রমলা ভড়বড় করে বলে উঠল, বিজু লক্ষ্মী ভাই, তুই যা, আমি ওকে একটু আমার ঘরে নিয়ে যাই— কলেজে আমরা ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলাম জানিস না বুঝি?

দূর্বাদির মুখ দেখে ব্যাপারটা তেমন খুশি হবার মতো কিনা বিজু ঠাওর করে উঠতে পারল না। অনুমতি দিল।—নিয়ে যা, কিন্তু বেশি রাত করিয়ে দিবি না—কাল আবার সকালে আসতে হবে।

হাত ধরে রমলা ওকে বাইরে টেনে নিয়ে এলো।—তুই আমাকে সত্যি অবাক করেছিস মাইরি!

এক কলেজ থেকে একই সঙ্গে দু'জনে বি. এ. পাশ করেছিল। কিন্তু দূর্বার সঙ্গে তখন ওর এখন কিছু ভাব-সাব ছিল না। দু' চারটে মুখের কথাও হতো না বড়। বড় লোকের মেয়ে, গাড়িতে আসত যেত। তখনো নাচের সুনাম ছিল। এখানে ওখানে ডাক পড়ত। স্তাবকের অভাব ছিল না। মাটিতে পা পড়ত না। যে মেয়েরা তোয়াজ তোষামোদ করত, ভাব কেবল তাদের সঙ্গে। তাদের নিয়ে ফুর্তি করত, টাকা ওড়াতো। দূর্বার মতো মেয়ে যে সর্বদাই নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকত, সে ওর কাছে পাত্তা পাবে কেন। কিন্তু আসলে রমলা তখন ভিতরে ভিতরে ওকে একটু হিংসেই করত। কলেজের সামনে বা কলেজের রাস্তায় অনেক ছেলের ছোঁক-ছোঁকানি দেখেছে। ওদের ধারণা, ওই ভিজে-বেড়াল মেয়ে একসঙ্গে বেশ কয়েকটা ছেলেকে খেলাচ্ছে। চুপচাপ থাকাটাও দেমাক ভাবত। যতই বড় লোকের মেয়ে হোক বা নেচে বেড়াক, সুন্দরী ছেড়ে তেমন

সুশ্রীও কেউ দেখত না রমলাকে। তখন রোগা আর ঢ্যাঙা ছিল। এখন তার থেকে শ্রী ফিরেছে। নাচের দৌলতে মোটা হয়নি, কিন্তু গায়ে মাংস-টাংস লেগেছে।

দোতলাতেই একটা ঘর ছেড়ে রমলার ঘর। এ-ঘরে গালচে বিছানো। নাচ প্র্যাকটিসে সুবিধে হয় বলে বোধহয়। একদিকে বাজনার সরঞ্জাম। দেয়ালে সারি সারি নাচের ঢঙের ছবি। ছোট কাচের আলমারিতে কাপ মেডেল সাজানো। এ-বাড়ির সবগুলো ঘরই বোধহয় দূর্বাদেব চারটে ঘবের সমান। নাচের মহড়ার সময় নিজের পিছন দিক দেখা যায় সে-রকম তিন-প্রস্থ আয়নার দুটো ড্রেসিং টেবিল। এ-ঘবে একটা বড় খাট ছাড়া বসার টেবিল চেয়ার নেই।

দূর্বার হাত ধরে রমলা তাকে গদীর খাটে বসালো। নিজেও বসল।—তুই অবাক করলি, শেষে কিনা বিজুব কমপেনিয়ন। তোর সেই প্রেমিকরা সব গেল কোথায়?

দূর্বার একটুও ভালো লাগছিল না। এবপব নিজের মা-কে কি বলবে না বলবে ঠিক কি। ঠাণ্ডা জবাব দিল, আমার কোনো প্রেমিক ছিল না। আমি [illegible] গরিবের মেয়ে জানা থাকলে কলেজে তোমরা আমাকে নিয়ে [illegible] ঠিসারা করতে না।

রমলা থমকালো একটু।—এমন বিচ্ছিরি করে বলিস, গরিবের মেয়ের প্রেমিক থাকতে পারে না?

—আমার মতো মেয়ের থাকতে পারে না, নিজেকে বাঁচাতে আমার হিমসিম খেতে হতো। চোখে চোখ রেখে আরো ঠাণ্ডা গলায় বলল, এ-কাজটা পেয়ে আমি কতখানি বেঁচে গেছি তোমার ধারণা নেই, আর বিজুরও আমাকে এরই মধ্যে খুব পছন্দ হয়ে গেছে—কিন্তু তোমার এ-সব ঠাট্টা থেকে ও যদি একটুও অন্য চোখে দেখে আমাকে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হবে।

রমলা বড় বড় চোখ করে একটু দেখল ওকে। তারপর কাঁধে

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, তুই একটা যাচ্ছেতাই প্র্যাকটিকাল মেয়ে হয়ে গেছিস—কলেজে তোকে আমি কত হিংসে করতাম জানিস না। ঠিক আছে, বিজু তোকে দেবী-টেবিই ভাববে'খন, কিন্তু আমার সঙ্গে তুই অমন পিসিমা-মুখ করে থাকলে হাটে হাঁড়ি ভাঙব বলে দিলাম।

—আমার হাটে কোনো হাঁড়ি নেই শুনলে তো।

—না থাকলেও আমি বানিয়ে বলব। চেহারাখানা যা রেখেছিস এখনো, কেউ অবিশ্বাস করবে না।

মুখের দিকে চেয়ে রমলা হাসতে লাগল। তারপব আচমকা যে-কাণ্ড করে বসল দূর্বা তার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না। ঝুঁকে ওকে দু'হাতে জাপটে ধরল। সরাসরি ঠোঁটে বেশ চেপে একটা চুমু খেয়ে বসল। তারপর দুই গালে। ছেড়ে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।—তোকে দেখে আমার কি-যে আনন্দ হচ্ছে···!

মেয়েটাকে বিকৃতিতে পেয়ে বসেছে কিনা দূর্বা ভেবে পেল না। তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে ফেরার চেষ্টা। হেসেই বলল, এবারে তোমার কথা বলো, খুব নাচছ?

—হ্যাঁঃ, কেবল নেচেই বেড়াচ্ছি, সে-রকম কাউকে নাচাতে পারছি না। ভালো লাগে না আর—

—কি ভালো লাগে?

—চুটিয়ে প্রেম করতে।

—অসুবিধের কি আছে, আঙুল নাড়লেই তো কতজন ছুটে আসবে।

—আঙুল তো নাড়ি, ছুটেও আসে, কিন্তু সব আমার বেয়ারা হবার মতো ছেলে, আমার বাজনা বইতে পারলেই কৃতার্থ একেবারে। কি মনে পড়তে হেসে সারা।—একবার একটা ছেলেকে একটু মনে ধরেছিল, বুঝলি—তা একদিন তাকে এ-ঘরে ধরে এনে বলা নেই কওয়া নেই বেশ করে জাপটে ধরে লম্বা-আ একটু চুমু খেয়ে

বসেছিলাম। ছেড়ে দিতে কাঁপতে কাঁপতে এই গালচেটার ওপর বসে পড়ল। আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, এবারে বাবাকে ডাকি? আবার এক প্রস্থ হাসি।—কি কবল জানিস, উঠেই চোঁ-চাঁ দৌড়, আর তারপরেই হুইস্কির তাড়া খেয়ে সিঁড়িতে ডিগবাজী—তার ফলে হাতে কমপাউণ্ড ফ্র্যাকচার।

হাসছে দূর্বাও। কিন্তু ভিতর থেকে সে-রকম হাসি আসছে না। —তাহলে এক কাজ করো, কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে বলো মা-কে, ঝুড়িঝুড়ি ছেলে এসে যাবে—দেখে শুনে একজনকে বিয়ে করে যত খুশি প্রেম করো।

—তুই একটা রাম হাঁদা, বিয়ের পরে প্রেম—ইডিয়েট আর কাকে বলে! কাগজে প্রেম করার মতো সর্বগুণ সম্পন্ন ছেলে চাই বলে বরং বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতে পারে—বিয়ের প্রশ্ন প্রেমের ফলাফল অনুযায়ী। নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল।

আগে হৃদ্যতা না থাকলেও এত দিন বাদে দেখা, কিন্তু অন্য কোনো কথা নেই। মেয়েটার মাথায় প্রেমজ্বর ভর করে আছে দূর্বার বুঝতে বাকি থাকল না। হাল্‌কা সুরেই জিজ্ঞাসা করল, প্রেম কবার মতো কি-রকম ছেলে পছন্দ তোমার?

রমলা অনায়াসে তুই তুই করে বলছে ওকে, কিন্তু দূর্বা তা পারছে না। পারার ইচ্ছেও নেই। রমলা জবাব দিল, নিজেই কি ছাই জানি কি-রকম পছন্দ, তবে চেহারা-পত্র ভালো হওয়া চাই। কি মনে পড়তে আবার হেসে উঠল।—চেহারা ভালো নয়, এ-রকম একজনকেও হঠাৎ মনে ধরেছিল, বুঝলি? রণদাকে দেখেছিস? আলাপ হয়েছে?

আবার কি শুনতে হবে জানে না। এ-বাড়িতে এই একজনের নাম অনেকবার শুনেছে। তাই উৎসুক একটু। মাথা নাড়ল— দেখেওনি, আলাপও হয়নি।

—আছিস যখন দেখা হবেই। ছোড়দার ছেলেবেলার বন্ধু ছিল, বাড়ির ছেলের মতো হয়ে গেছে। চেহারা ভালোর কাছাকাছিও

নয়, তার ওপর আদর্শ ধুয়ে জল খায়। তবু দিনকতক কেন যেন তাকেই বেশ ভালো লাগতে লাগল। কিন্তু ও-যে মনে মনে ছোড়দার থেকেও আপনার দাদা হয়ে বসে আছে তা কি ভেবেছি। একদিন রণদাকে জোরজার করে এই ঘরে ডেকে এনে চিত্রাঙ্গদার নাচ দেখালাম। আমি ভাবলাম, মুণ্ডু ঘুরে গেছে। জিগ্যেস করলাম, কেমন ?

রণদা বলল, অখাদ্যি।

ওই রকমই বলে। আবার জিগ্যেস করলাম, কি অখাদ্যি, আমি না নাচ ?

রণদা বলল, তুইও তোর নাচও।

আমি তখন সরাসরি মুখ ঝামটা দিলাম। বললাম, ছেলেরা দেখি বন্ধুর বোনের সঙ্গে প্রেম করে, আর বোনও দাদার বন্ধুর সঙ্গে প্রেম করে থাকে। তুমি কি-রকম উজবুক একটা ?

···শুনে একটু চেয়ে রইল, তারপর ঠোঁটে হাসি মাখিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি ভাবলাম হয়ে গেছে, এবারে চুমুটুমু খাবে। ও-মা, কাছে এসে তালুর ওপর সে-কি এক গাঁট্টা ! আমি চোখে অন্ধকার দেখে একটা চিৎকার করে বসে পড়লাম— তালুর ওপর একটা সুপুরি গজিয়ে গেছে। চিৎকার শুনে মা আর বড়দি ছুটে এলো। রণদা তখনো হাসছে। বলল, কিছু না মাসিমা, ছোট বোনকে একটু আদর করলাম। ব্যস, প্রেমের লিস্ট থেকে রণদা ছাঁটাই !

শুনে দূর্বা হেসেই ফেলল।

নির্মলা সরকার ঘরে ঢুকলেন। দূর্বা সঙ্গে সঙ্গে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। মহিলা প্রথমে মেয়েকে বললেন, তুই এসে গেছিস ? দূর্বার দিকে ফিরল, তুমি এখনো আছ কিনা ভাবছিলাম। কাল তো রোববার, অন্য দিন না পারলেও রোববারে রণ এসে থাকেই— সে কাগজের কাজে বাইরে চলে গেছে শুনলাম।···তুমি কাল দুপুরটা

অন্তত এসে থাকতে পারবে? আমি অবশ্য তার জন্য এক্সট্রা যা-হয় দেব—

রবিবারে ছুটি কিনা দূর্বা তা-ই জানে না। বলল, কিছু দিতে হবে না, আমি আসব।

নিশ্চিন্ত হয়ে নির্মলা সরকার মেয়ের দিকে ফিরলেন।—বিজুর এরই মধ্যে ওকে খুব পছন্দ হয়ে গেছে, কাল তুই ব্যস্ত ছিলি, নইলে কালই আলাপ হয়ে যেত।

মেয়ে তড়বড় করে উঠল।—আলাপ হয়ে যেত! কলেজে আমরা ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলাম, একসঙ্গে বি. এ. পাশ করেছি, বুঝলে? কাকে পেয়েছ জানো না তো, আমি ছেলে হলে কলেজে পড়ার সময়েই ওকে বিয়ে করে বসতাম—কত মাইনে ঠিক করেছ?

—পাঁচশ। মায়ের আমতা-আমতা জবাব।

—ঠিক জানি ঠকাবে। ওর মতো মেয়েকে হাজার টাকা দেওয়া উচিত।

—সে আস্তে আস্তে দেখা যাবে'খন, তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে বিজুর মুখ মনে পড়তে দূর্বার এই টাকা-পয়সার কথা একটুও ভালো লাগল না।

পরদিন বাড়িতে খাওয়া সেরে দূর্বা বারোটার মধ্যে সরকার বাড়িতে হাজিরা দিল। বিজু জানত আসবে। খুব খুশি। রমলা বাড়ি নেই শুনেও দূর্বা স্বস্তি বোধ করল। তার বাইরে কোথায় লাঞ্চের নেমন্তন্ন। সুমতির কাছ থেকে খাওয়ার ওষুধ বুঝে নিয়েছে। শিশির লেবেল পড়ে মনে হলো, রাতেরটা ঘুমের ওষুধ, সকালের ট্যাবলেটেও কি আছে ঠিক বোঝা গেল না। গত কাল দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটু ঝিমুনি ভাব দেখেছিল। আজ গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়েই পড়ল। না, সে-রকম দুর্বল বা নিস্তেজ দেখেনি তার আগে, তবু ঘুমিয়ে পড়তে দেখে দূর্বার ভয়। কিন্তু যে-রকম হলে

তৎপর হওয়ার নির্দেশ সে-রকম মনে হলো না। তবু সুমতিকে একবার ডেকে দেখিয়ে নিশ্চিন্ত। সে জানালো, সে-রকম কিছু না—খারাপ দেখলে অনেক আগে থেকেই বোঝা যায়।

ঘড়িতে তখন আড়াইটে। বিজু ঘুমনোর ফলে বাড়ি নিঝুম। দূর্বা বিজুর একটা ইংরেজি বই পড়তে পড়তে গল্পের পুঁজি বাড়াচ্ছে। হঠাৎ সচকিত। অঞ্জন সরকার দরজার কাছ থেকে প্রথমে ঘুমন্ত বিজুকে দেখল। তারপর ঘরে ঢুকে খুব আলতো করে পালস পরীক্ষা করে ইশারায় দূর্বাকে ডেকে বাইরে এসে দাঁড়াল। দূর্বা দরজার কাছে আসতে মৃদু গলায় বলল, আমি একটু বেরুচ্ছি, ফিরতে সন্ধ্যা হবে··· বিজু ভালোই আছে, তবু যদিই দরকার হয়, এই নম্বরে আমাকে ফোনে পাওয়া যাবে।

কাগজে লেখা একটা ফোন নম্বর তার হাতে দিয়ে চলে গেল।

দূর্বা এরই মধ্যে একটা নোট বই করে ফেলেছে। সুমতিকে জিগ্যেস করে এ-বাড়ির তিনটে ফোন নম্বর, রণিত দত্তর কাগজের আপিসের আর মেট্রন বিশাখা ব্যানার্জীর হাসপাতালের নাম্বার লিখে রেখেছিল। চিরকুটের এ নম্বরও লিখে রাখল।

আর বেশিক্ষণ পড়তে ভালো লাগল না। বই ফেলে বিজুর একটা ছবির বইয়ের পাতা উল্টে উল্টে দেখল খানিকক্ষণ। দূরে কোনো বাড়ির একটা খাঁচার কোকিল থেকে থেকে ডেকে উঠছে। ওটাও যেন নির্জনতার নালিশ জানাচ্ছে।

দূর্বা পায়ে পায়ে ঘরের বাইরে অর্থাৎ ভিতরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। এ-মাথা ও-মাথা ফাঁকা। রেলিং-এর কাছে হুইস্কিও গা ছেড়ে ঘুমোচ্ছে।

হঠাৎ রীতিমতো অবাক দূর্বা। অথচ হবার মতো কিছু ছিল না। তিনতলা থেকে পা-টিপে নেমে আসছে কমলা সরকার। বড়দি। শাড়ির আড়ালে তার হাতে চটি-মতো একটা বই সম্ভবত। দূর্বাকে দেখেই হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাতের জিনিস আরো

আড়ালে। অমন গুরুগম্ভীর বড়দির কিছু চুরি ধরা-পড়া গোছের মুখ মুহূর্তের জন্য। তারপরেই যে-কে সেই। টান হয়ে নেমে এসে ওদিকের ঘরে ঢুকে গেল। দূর্বা বিমূঢ় খানিক। কমলা সরকারের এ-রকম আচরণের কোনো অর্থ ই খুঁজে পেল না।

॥ পাঁচ ॥

সেই বিশেষ দিনের একখানা সবুজ রঙ্গ দূর্বা বোসও কিনেছিল। প্রথম পাতাতেই মস্ত জায়গা জুড়ে ছবিটা ছাপা হয়েছিল। জলে ডোবা কলকাতার রাস্তা, সেই জলে বিরাট মিছিল, তার ফলে অনড় অসংখ্য মোটর ট্যাক্সি লরি বাস মিনি। একটা বাসে ভেজা শাড়ি গলা পর্যন্ত জড়িয়ে বিরক্ত গম্ভীর মুখে বসে আছে যে-মেয়ে সে দূর্বা বোস। যে-ভাবে সাজানো হয়েছে তার ছবিই সকলের আগে চোখে পড়বে। দূর্বা ওটা কাউকে দেখায়নি। শেফালিকেও না। দাদুকে দেখানো যেত। কিন্তু পরদিন থেকেই এমনি ব্যস্ত হয়ে পড়ল, দেখানোর ফুরসৎ মেলেনি।

যে-ভাবে তাকে ডেকে ছবিটা তোলা হয়েছিল, দূর্বার সেদিন রাগ হয়েছিল সত্যি কথা। কিন্তু পরদিন থেকে রাগের ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। কারণ তার এই কাজটা জোটার মূলে ওই ঘটনা। নইলে দাদুর মনেও পড়ত না। পাঁচশ টাকা মাইনে যেমন অভাবিত, বিজুর মতো একটা ছেলের এমন কাছে আসতে পারাটাও তেমনি ভাগ্যের ব্যাপার ভাবে।

কিন্তু মনে যাই থাক, সরকার বাড়িতে রণিত দত্তর সঙ্গে প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারটা একটুও হাল্‌কা পর্যায়ে টেনে নিয়ে যেতে রাজি

নয় দূর্বা বোস। তাছাড়া ও-বাড়িতে রণিত দত্ত ঘরের ছেলে। আর সে মাস মাইনের চাকুরে। ওই লোকের কথামতো দাদুই পাঠিয়েছে তাও জানতে বাকি থাকবে না। ফলে একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলাই ভালো। না, দেখা হলে ও-ভাবে ফোটো তোলার কথা বা লোকটার মুখ দূর্বার মনেও পড়বে না। কিন্তু প্রথম দিনের দেখাশুনার পর্ব ঠিক হিসেব-মতো হলো না।

বিজুর ছবি আঁকা শেখার দিন সেটা। দূর্বার দশটায় অর্থাৎ আরো ঘণ্টাখানেক বাদে এলেই চলত। কিন্তু এই চার পাঁচ দিন ধরেই রমলাটা অবুঝের মতো জ্বালাতন করছে। সে বাড়িতে থাকলে তার ঘরে তার সঙ্গে বসে আড্ডা দিতেই হবে। খুব বেশি সময় বাড়িতে থাকে না এই যা রক্ষে। কিন্তু যখন থাকে, এই নিয়েই ভাই-বোনে ঝগড়া হয়ে যায়। রমলা দূর্বাকে তার ঘরে নিয়ে যেতে চাইলে বিজু ক্ষেপে যায়। যা মুখে আসে তাই বলে বসে। রমলারও রাগতে সময় লাগে না। ফলে তাদের মা ছুটে আসে। রমলা তাকে বলে, অসুখ বলে আসকারা দিয়ে তুমি ওকে মাথায় তুলেছ। আর বিজু দূর্বাকে বলে, আমার কাছে আসতে হবে না, ওই ধিঙ্গির ঘরে গিয়ে নাচ শেখো গে যাও। রমলা দাঁত কিড়মিড় করে হাত তুলে মারতে আসে। গায়ে হাত ছোঁয়াতেও পারবে না বিজু সেটা ভালো জেনে বসে আছে। সেও পাল্টা হাত তুলে দাঁত মুখ খিঁচোয়। আজ দূর্বার এক ঘণ্টা আগে হাজিরা দেবার উদ্দেশ্য বিজু যতক্ষণ আঁকা শিখবে, ও ততক্ষণ রমলার ঘরে তার কাছে বসবে।

দূর্বা এখন দোতলায় এলে হুইস্কি এগিয়ে এসে পায়ের কাছে একটু মাথা ঘষে সোহাগ জানায়। দূর্বাও নির্ভয়ে তার মাথায় একটু বিলি কেটে দেয়। তারপর দু'জনে একসঙ্গে বিন্দুর ঘরে ঢোকে। বিজুকে একবার দেখা দিয়ে রমলার ঘরে চলে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু ঘরে পা দিয়ে দাঁড়িয়েই পড়তে হলো। টেবিলের দু'দিকে মুখোমুখি বসে বিজু আর তার আঁকার মাস্টার। তাদের পাশে ইজিচেয়ারে বসে

আর কেউ, দু'হাতে খোলা খবরের কাগজের আড়ালে মুখ। পরনে পা-জামা পাঞ্জাবি।

বিজুর দরজার দিকে মুখ। দূর্বাকে আগে সে-ই দেখল। সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল।—দূর্বাদি এসো, এই দেখো রণদা এসে গেছে—কাল রাতে এসেছে, আমি আর যেতেই দিইনি।

কাগজ বন্ধ হলো। রণিত দত্ত সোজা হয়ে বসল। তারপরেই দুই ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল একটু। কিছু স্মরণ করার চেষ্টা। মনে পড়ল বোধহয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য হতচকিত মুখ।

দূর্বা দু'হাত জুড়ে একটু নমস্কার জানানোর মতো করল। সঙ্গে সঙ্গে ওই লোকের সপ্রতিভ হবার চেষ্টা। দু'হাত কপাল পর্যন্ত তুলে প্রতিনমস্কার জানিয়ে চটপট উঠে দাঁড়ালো। বলল, বসুন, কাল আমি এসেই শুনলাম আপনি তার এক মিনিট আগে চলে গেছেন। আমি থেকে যাব কথা দিতে বিজু ঘুমিয়েছে।

সৌজন্য বোধে দূর্বার ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির আঁচড় পড়ল। বিজুর দিকে ফিরে বলল, তুমি কাজ করো, আমি একটু রমলার কাছে যাচ্ছি।

ফেরার আগেই রণিত দত্ত বলল, বাইরের কে একজন ড্যান্সার এসেছে, রমলা তার শোয়ের টিকিট কিনতে বেরিয়েছে। চলুন আমরা ততোক্ষণ ও-ঘরে গিয়ে বসি।

অগত্যা দূর্বা তার সঙ্গে ঘর ছেড়ে বারান্দায়। অকারণে হঠাৎ রমলার ওপরেই রাগ হতে লাগল। বারান্দায় এসে রণিত হাঁক দিল, সুমতি মাসি, বসার ঘরে দু'পেয়ালা চা পাঠাও!

শুধু চা নয়, আরো কিছু আসে জানে না। দূর্বাকে ডাকল, আসুন—

দোতলার বসার ঘরে।—বসুন, বসুন।

তার ব্যস্ততা তেমন অকৃত্রিম মনে হলো না দূর্বার! হয়তো আশা করছে, বর্ষার দিনের সেই মুখ এখন আর মনে নেই। তার মুখোমুখি

সোফায় বসে রণিত দত্ত তড়বড় করে বলে গেল, কাল রাতে মাসিমা আর সুমতি মাসির মুখে আপনার খুব প্রশংসা শুনলাম, এমন কি বড়দা—যে কোনো সাত পাঁচ কথার মধ্যে নেই—সে-ও বলল, বেশ ভালো মেয়ে, বিজুকে ক'দিনের মধ্যেই আপনার করে নিয়েছে। আর সকাল থেকে বিজুর মুখে তো কেবল আপনার কথা। আপনি কত ভালো ছবি আঁকেন, সাদা কাগজ দেখিয়ে সেই গপ্পও করেছে। আপনার মতো একজনকে পাওয়ার ফলে সক্কলেই বাহাদুরিটা আমাকে দিচ্ছে—আমি শুধু মাস্টারদাদুকে বলে রেখেছিলাম, তাইতেই সব ক্রেডিট আমার!

সহজ হবার চেষ্টায় শব্দ করে হেসে উঠল।—আমার নাম রণিত দত্ত, আমি 'সবুজ রঙ্গ' পত্রিকার রিপোর্টার, আর—

দূর্বার ঠোঁটের ফাঁকে নির্লিপ্ত হাসির রেখা। মাঝখানেই ছেদ ঘটালো।—জানি!

—আপনি জানলেন কি করে! নড়েচড়ে বসল।—ও···মাস্টার দাদু বলেছেন? · হ্যাঁ, তাঁর ওখানে এক আধ সময় দেখেছি মনে হচ্ছে।

যা কখনো বলবে না ভেবেছিল, সে-কথাই ফস করে বলে বসল।—আরো কোথাও দেখেছেন।

ভুরু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা।—কোথায় বলুন তো?

—বৃষ্টির দিনে মিছিলে আটকে যাওয়া বাসে।

মুহূর্তের জন্য মুখখানা দেখার মতোই হলো বটে। দূর্বার সমস্ত মুখ ব্যক্তিত্বে মোড়া। হাসার ইচ্ছে নেই। সুমতি ঘরে ঢুকতে লোকটা বিড়ম্বনা সামলে উঠল। তার হাতের ট্রেতে দু'পেয়ালা চা আর একটা প্লেটে খাবার। সামনে রাখতে রণিত বলল, আমার একরাশ খাওয়া হয়ে গেছে. ওটা আপনার। চায়ের পেয়ালা তুলে নিল।

দূর্বা সুমতিকে বলল, যে দু'দিন দেরিতে আসি আমিও খেয়েই আসি—ওটা নিয়ে যাও মাসি।

সুমতির অনুরোধে দূর্বাও তাকে তুমি বলা শুরু করেছে। দূর্বাও নিজের পেয়ালা তুলে নিল। রণিত বলল, মাসিমাকে খবর দাও, মিস বোস এসেছেন—

দূর্বা সোজা তাকালো তার দিকে।—আমি রোজই আসছি—আসব, তাঁকে বিরক্ত করার কি দবকার ?

থতমতো খেল একটু।—ও, ঠিক আছে, ও-ঘর থেকে তাহলে আমার সিগারেটের প্যাকেটটা দিয়ে যাও।

সুমতি চলে যেতে তার দিকে ফিরে সৌজন্যের আতিশয্য দেখালো।—আমি আবার একটু বেশি সিগারেট খাই, আপনার অসুবিধে হবে না তো ?

পরিস্থিতি যা, দূর্বাই যেন এই লোকের থেকে বেশি জোরের ওপর দাঁড়িয়ে। কয়েক পলক চেয়ে থেকে ফিরে বলল, আপনি আদর্শবাদী মানুষ অথচ বেশি সিগারেট খান ?

হেসে উঠল।—আমি আদর্শবাদী এ-খবর আপনাকে কে দিল ? তা'ছাড়া আদর্শেব সঙ্গে সিগারেটের কি সম্পর্ক, এটা নিছক নেশা।

দূর্বার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে কবছিল, মদও নেশা, সেটা তাহলে কি চোখে দেখেন ? বলল না। গায়ে পড়া কথার মধ্যে সে নেই।

সুমতি সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই আর একটা অ্যাশপট রেখে গেল। মেয়েদের বসার ঘর বলেই হয়তো এ-ঘরে অ্যাশপট নেই। সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে একটু ইতস্তত করতে দেখে দূর্বা বলল, আমার কিছু অসুবিধে হবে না।

—থ্যাংস। সিগারেট ধরালো।

যে-প্রসঙ্গটা মূলতবী আছে সেটার সম্পর্কে দু'জনেই সচেতন। রণিত বিড়ম্বনা ছেঁটে ফেলার মতো করে হেসে বলল, আপনি চিনতে পারবেন না ভেবে ভুল করেছি···ও-ভাবে ছবি তোলার জন্য আপনি নিশ্চয় খুব রেগে গেছেন ?

দূর্বা চুপচাপ চেয়ে রইল একটু, যার সাদা অর্থ, কি মনে হয়,

খুশি হব ? তারপর ঘুরিয়ে জবাব দিল, ব্যাপারটা বোঝার পর বাসের কেউ কেউ নামতে যাচ্ছিল—

কথাটা দূর্বা বানিয়েই বলল। প্রতিক্রিয়া দেখছে।

—হুঁ ! আমি আর মানুষ চিনি না, এক হাঁটু জলে নেমে বীরত্ব দেখাবে। আর এলেও আমার সঙ্গে আইডেন্টিটি কার্ড ছিল—কি জন্যে ছবি তোলা হয়েছে বোঝাতে আধমিনিটও লাগত না। কিন্তু আপনি রেগে গিয়ে থাকলে আমি খুব দুঃখিত···আমি কাগজের ইন্টারেস্টে ছবিটা তুলেছিলাম—আপনি পরদিনের কাগজ দেখেছেন ?

দূর্বা হাঁ না কিছুই বলল না। দাদুর ঠাট্টা মনে পড়ল। অমন জলে-ভেজা ফোটো যে তুলেছে সে রাতে ওটা বিছানায় নিয়ে যাবে না !—প্রাণের সাধে চুমটুমু খাবে না ! মুখে লালের ছোপ লাগলেও দূর্বার হঠাৎ রাগই হচ্ছে। ঠাণ্ডা গলায় বলল, কাগজের ইন্টারেস্ট তো শেষ হয়েছে, নেগেটিভটা আমাকে দিয়ে দেবেন।

—কোথায় পড়ে আছে ··আচ্ছা খুঁজে দেখব'খন।

শুনে দূর্বার আরো রাগ হয়ে গেল। আর ওই লোক সেটা বুঝলও। হাসি মুখে কৈফিয়তের সুরে বলল, আপনি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন বুঝতে পারছি, আর পর-দিনের সবুজ রঙ্গ দেখেছেন ধরে নিচ্ছি। এবারে বলুন, আপনি না হয়ে আর কোনো মেয়েকে দেখলে আপনার রাগ হত না ওই ছবি দেখে বেশ একটা বর্ষার কাব্যের মতো মনে হত ? ওই ছবির জন্য আপিসে আমার কত নাম হয়েছে জানেন ?

রাগ আবার আপনা থেকেই তরল হয়ে আসছে দূর্বার। ওই ছবির দৌলতেই এ-বাড়ির সঙ্গে এমন যোগাযোগ সে তো আর ভোলবার নয়। ঢ্যাঙা লোকটার কালো মুখে বেশ একটু ছেলে-মানুষি কমনীয়তা চোখে পড়ছে এখন। তবু পলকা গাম্ভীর্যে জবাব দিল, আপনার নাম হয়েছে, আমার লোকের কাছে মুখ দেখানো দায় হয়েছে।

রণিত দত্ত থমকালো। ভূরু কোঁচকালো।—আপনাকে কেউ কিছু বলেছে বুঝি? যারা বলেছে তারা মুখ্যু। আপনি রমলার ক্লাসফ্রেণ্ড আর বি. এ. পাশ শুনেছি—আপনার অন্তত বোঝা উচিত অতবড় বর্ষার আর মিছিলের আর গাড়ির জ্যামের স্টোরিটাতে রঙ ফলানোর জন্য ওই ছবি তোলা হয়েছে। তারপরেই রেগে ওঠা ছেলেমানুষের মতো ডম্ফাই, আমি কখনো কোনো নোঙরামির মধ্যে নেই এ আপনি জেনে রাখতে পারেন। এ-বাড়ির মাসিমার কাছেও ওই ছবি নিয়ে নালিশ করে দেখুন উনি কি বলেন। যান, ওই ছবির নেগেটিভও আপনাকে দিয়ে দেব, ভালো ছবি পরে অনেক সময় বেশি দামে বিক্রি হয় বলে নেগেটিভ যত্ন করেই রেখেছি।

দূর্বা বেশ কৌতুক বোধ করছে। গাঁট্টার চোটে এই লোক রমলার মাথার তালুতে সুপুরি ফলিয়েছিল তা-ও মনে পড়ল। নিরীহ মুখ, নিরীহ চাউনি।—এখন তো মনে হচ্ছে আপনি আমার থেকে বেশি রেগে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে এক পশলা হাসি। পরিষ্কার মুখ। যাক, আমি ভেবেছিলাম আপনি সাংঘাতিক রেগে গেছেন তাই আমারও রাগ হয়ে যাচ্ছিল। আজ কালের মধ্যেই মাস্টার দাদুর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আসব—রাতে আর সকালে আপনার কথা শুনেছি তো—আপনাকে দেখেই আমার দারুণ ভালো লাগল, মনে হলো, বিজু যেমন চায় সব দিক থেকে তেমনটি হলো।

উচ্ছ্বাসের কথা শুনে দূর্বার মুখ লাল একটু। সব দিক থেকে বলতে চেহারা-পত্রের এই দিকও ছাড়া আর কি হতে পারে? ছবি তোলার মতো দারুণ ভালো লাগাটাও নিঃশঙ্ক বেপরোয়া গোছের মনে হলো।···পুরুষের মুখে অনেক জটিলতা দেখেছে দূর্বা বোস, চাউনিতে অনেক বীভৎস লোলুপতা দেখেছে। এই মুখ বা চাউনি সে-রকম নয়।

সাত আট মিনিটের মধ্যে রণিত দ্বিতীয় সিগারেট ধরালো।

নির্মলা সরকার আসছেন। দূর্বা সিগারেট আড়াল করতে দেখল না। তাঁর সামনে ওটা চলে বোঝা গেল। চাপা গলায় বলল, মাসিমা যে-মুখ করে আসছে, আমাকে ঝাড়বে মনে হচ্ছে।

মহিলার ব্যক্তিগত কথা কিছু থাকতে পারে ভেবে দূর্বা উঠে দাঁড়ালো। নির্মলা সরকার কাছে এসে বললেন, উঠলে কেন, বোসো —বিজুর মাস্টার দশটা সাড়ে দশটার আগে যাবে না। ও-দিক ফিরলেন, তোর মতলব খানা কি ? সুমতিকে বারোটায় লাঞ্চ দিতে বলেছিস ?

—হ্যাঁ, একবার আপিস যেতে হবে।

—আর বিজু যে বলে দিল চার-পাঁচ দিনের মধ্যে তোর যাওয়া হবে না ?

সিগারেটে লম্বা টান পড়ল। হাসছে।—বিজুকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেই যাব। তোমাকেও বোঝাতে হলে তো মুশকিল। কেন তোমার ক্লাবের ফরমাশ কিছু আছে ?

রেগেই গেলেন।—আমার ক্লাবের চিন্তায় তো তোর ঘুম নেই একেবারে! ক'দিন বাদে এলি, দু'চার দিন থাকা যায় না এত কাজ তোর ? কাজ থাকলেও সেরে চলে আসা যায় না ?

—আ-হা, বুঝছ না, রাত এগারোটা বারোটার পর দশ মাইল পথ ঠেঙিয়ে আসি কি করে। বাইরে থেকে এ ক'দিনে যে কাজের বোঝা নিয়ে এসেছি, ক'টা দিন এখন হিমসিম খেতে হবে।

নির্মলা সরকার আরো তেতে উঠলেন।—তাহলে তুই এ-কাজ নিয়েই পড়ে থাক, আমি তোর মেসোমশাইকে সাফ বলে দিচ্ছি আর কারো আশায় থেকে কাজ নেই, নিজে যা পারে করুক নয়তো কারবার গুটিয়ে ফেলুক। এই বয়সে একজন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খেটে মরছে আর উনি ঘণ্টার এক কাগজে বসে সমাজ সেবা করছেন —এ-ভাবে সময় নষ্ট করলে শেষে তোর সেবা কে করবে ?

চলে গেলেন। সিগারেট অ্যাশপটে গুঁজতে গুঁজতে হাসি মুখে

রণিত দূর্বার দিকে তাকালো।—ঘাবড়াবেন না, এখানে থাকলেই এটুকু আমার নৈমিত্তিক বরাদ্দ।

দ্বিধা কাটিয়ে দূর্বা জিজ্ঞাসা করল, উনি আপনাকে ব্যবসার দায়িত্ব নিতে বলেন বুঝি··· ?

মাথা ঝাঁকালো। তাই। বলল, আমার ওনলি কোয়ালিফিকেশন হলো আমি এ-বাড়ির মেজ ছেলে সুজন সরকারের ছেলেবেলার বুজম্ ফ্রেণ্ড্। আমার মতো অকর্মা যাবে ওদের এতবড় বিজনেসে মাথা গলাতে। চিন্তা-ভাবনা যা-কিছু সব এই মাসিমার মাথায়, বুঝলেন। নইলে মেসোমশাই নিজেকে বুড়োও ভাবেন না, অসহায়ও ভাবেন না —তাঁব জেনারেল ম্যানেজার আছে, ম্যানেজার আছে, বিজনেস সেক্রেটারি আছে, এজেন্ট আছে, সেলস অফিসার আছে—কিন্তু মাসিমার একটুও তাদের ওপর বিশ্বাস নেই, তার ধারণা ওরাই তার ভদ্রলোকটিকে ডোবাবে একদিন। মেসো রেস খেলেন, রাতে ক্লাবে-ট্লাবে যান—তাইতে আরো অবিশ্বাস। মাসিমা ফাঁক পেলেই তাঁকে আমার কথা বলে আর উনিও সায় দেন, রণ এলে তো ভালই হয়—বলে দেখো।

দূর্বার মনে হলো, মানুষটা সরল। নইলে একদিনের এটুকু আলাপে কারো ঘরের কথা কেউ এমন অনায়াসে বলে না।

রণিত দত্ত নিজে থেকেই আরো একটু বিস্তার করল।—মাসি-মারও অবশ্য দোষ নেই। অমন তাজা ছেলেটা হুট করে মারা গেল, নইলে ব্যবসার হাল এত দিনে সে-ই ধরত। ও-দিকে বড়দার আশা তো আগে থেকেই ছাড়তে হয়েছে, কারো কথায় কান না দিয়ে সে ডাক্তার হয়ে বসল—

দূর্বা নতুন কিছু শুনল যেন। উৎসুক।—বড়দা মানে এ-বাড়ির বড়দা ? তিনি ডাক্তার নাকি ?

—বাঃ! আপনি জানেন না ? আপনার সঙ্গে বড়দার আলাপ হয়নি ?

—হয়েছে···আমাকে ডেকে বিজুর কখন কি করতে হবে না হবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন···কিন্তু নিজেও ডাক্তার জানতাম না।

বড়দার প্রসঙ্গে এই লোককে বেশ উৎসাহিত দেখা গেল। সোজা হয়ে বসে আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, শুধু ডাক্তার—কলেজের সব পরীক্ষায় আগাগোড়া ফার্স্ট হওয়া ডাক্তার। দেখতে দেখতে তারপর দিব্বি প্র্যাকটিসও জমিয়ে বসেছিল—ওদিকে এম-ডি দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল।···তার মধ্যে তিন-তিনটে বিভ্রাট—একটা বড়দার হিসেবে ছোট, দুটো বড়।

দূর্বা তেমনি উৎসুক।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে রণিত বলে গেল, এক, হাসপাতালের এক নার্সকে ঝোঁকের বশে বিয়ে করে বসেছিলেন—তার সঙ্গে ডিভোর্স। সেই মহিলাকে এখানেও দেখবেন, বিজুকে ভালবাসে—

—দেখেছি। দূর্বার খুব শোনার ইচ্ছে ছিল ডিভোর্স কেন।

—ও···। সুজনের অ্যাকসিডেণ্ট আর ডেথ। দুই বৃষ্টির রাতে গাড়ি হাঁকিয়ে আসছিল কলকাতার বাইরে থেকে, একটা ট্রাকের সঙ্গে হেড-অন কলিশন। হাসপাতালে আনার আগেই শেষ। অমন তরতাজা ছেলেটার ভাঙ্গাচোরা বীভৎস মূর্তি সকলেই দেখেছে, কিন্তু বড়দা তারপর থেকে কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল। ডিভোর্সের আগে থেকেই মদ ধরেছিল, সুজন চলে যাবার পরে মাত্রা বাড়তে থাকল।···তিন, বিজুর এই অসুখ। ব্যস, বড়দারও ডাক্তারি জীবন খতম। দু'চোখের চাপা বেদনায় রণিত দত্তর মুখও অন্যরকম এখন। একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার মতে বড়দার ডাক্তার হওয়াও ভুল হয়েছে, ভিতরে ভিতরে এক মস্ত দার্শনিক বুঝলেন···এক আমি ছাড়া আর তাকে কেউ বুঝতেই পারে না। বিজুর সম্পর্কে বড়দা কি বলে জানেন? বিজু হলো ইণ্ডিয়া, কেউ ছেড়েও থাকতে পারে না, ইণ্ডিয়ার রক্ত খারাপ হয়ে গেছে কিন্তু একবার রক্ত বদলাতেই তিরিশটা বছর লেগে গেল। সেণ্টারে জনতা সরকার

এলো, বড়দা টিপ্পনী কাটল, নতুন রক্তে কত দিন চলে ছাখ। শুনে আমি রেগে গেছলাম কিন্তু এরই মধ্যে হালচাল না দেখছি···যাক গে, বড়দার মজার কথা শুনুন, ডিভোর্সের পরেও বিশাখা বউদি বিজুকে দেখতে আসে—বড়দা হেসে মন্তব্য করেছিল, আসবে না কেন, গদি-ছাড়া হলেও ইন্দিরা কি ইণ্ডিয়াকে ছেড়ে থাকতে পেরেছে ?

কান পেতে শোনার মতো। বড়দা এরকম ধারণা ছিল না। দূর্বাকে ঘরে ডেকে নিয়ে যা বলেছিল মনে পড়ছে। নিজে ডাক্তার বলেই অত সহজ করে বলতে পেরেছে। আর দাতুর আশার কথা শুনে কিরকম হেসে বলেছিল, লেটস হোপ সো, কিন্তু উনি কিছু জানেন না। তু'কথায় এ-রোগের ব্যাপারটা বুঝিয়েও দিয়েছিল। একটু চুপ করে থেকে দূর্বা বলল, প্র্যাকটিস না করলেও এখনো তো উনি খুব পড়াশুনা করেন দেখলাম···

শুনে বিস্ময়ের কারণ ঘটল যেন কিছু। মানুষটাকে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসতে দেখল। দূর্বার চোখে চোখ রেখে সিগারেট অ্যাশপটে গুঁজল।—আপনি পড়াশুনা করেন দেখলেন···কোথায় দেখলেন ?

—তাঁর ঘরে। বিজুর সম্পর্কে সব বুঝিয়ে দেবার জন্য আমাকে তার ঘরে ডেকেছিলেন বললাম, সে দিনই।

—কখন ডেকেছিলেন, দিনে না রাতে ?

দূর্বা থতোমতো খেলো একটু।—সন্ধ্যের পরে। ঘরের আলমারিতে মোটা বই দেখলাম···

—সেই মোটা বই পড়ছিল ?

—না, চটি মতো···।

—আর ড্রিংক করছিল ?

তুর্বোধ্য লাগছে দূর্বার। মুখের ওপর চোখ তুলে সামান্য মাথা নাড়ল।

রণিত দত্ত এবারে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। রকম সকম দেখে দূর্বা আরো অবাক।

—যাক, বড়দা ঘরে না থাকলে সময় কাটানোর জন্য একটা

বই-টইয়ের খোঁজে কখনো যেন গিয়ে হাজির হবেন না, বা কোনো বই-টই টেনে বার করবেন না।

দূর্বা হকচকিয়ে গেল।—কেন, উনি কি বই পড়েন?

অম্লানবদনে জবাব দিল, পর্নোগ্রাফি। কোত্থেকে যে পাঁজা পাঁজা এসব বই যোগাড় করে আনে সেই জানে। আমি একবার একটা বই চেয়ে নিয়েছিলাম—আরে ব্বাপ রে বাপ! কি কুৎসিত আর কি জঘন্য—পাঁচ দশ পাতা ওলটাতেই এমন ঘা ঘুলিয়ে উঠল যে তাড়াতাড়ি ফেরত দিয়ে হাত ধুয়ে বাঁচলাম।

দূর্বার সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এক দুপুরের সেই দৃশ্য মনে পড়েছে।···কোকিল-ডাকা নির্জন দুপুরে বড়দি সন্তর্পণে, তিনতলা থেকে নেমে আসছে তার খানিক আগে দূর্বাকে বলে বড়দা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। শাড়ির আড়ালে বড়দির হাতে চটি বইয়ের মতো কিছু একটা। ওকে দেখে সেই গুরুগম্ভীর বড়দির কয়েক মুহূর্তের জন্য চুরি ধরা পড়া গোছের মুখ।

—বাঃ! আপনি দারুন লজ্জা পাচ্ছেন যে দেখি। রণিত দত্ত বেহায়ার মতো চেয়ে আছে আর মজা পাচ্ছে। বলল, বড়দা না হয়ে আর কেউ হলে আমি সব পুড়িয়েই ফেলতাম। রেগেমেগে বড়দাকেই বলেছিলাম, এ কি প্রবৃত্তি তোমার—কি জঘন্য জিনিস পড়ো তুমি? তার জবাব কি শুনবেন? নির্বিকার মুখ করে বলল, প্রবৃত্তি ভালো করার জন্যেই তো পড়ি। এগুলো হলো সেফটি ভালব—পড়লে ভিতরের কামনা বাসনা সব ক্ষয় হতে থাকে—তখন গঙ্গার বাতাসের জন্য ভিতরটা আঁকুপাঁকু করে।

দূর্বার মুখ লাল তখনো। উঠতে পারলে বাঁচে। পরিস্থিতির মোড় ফেরালো রমলার সরব পদার্পণে।—গুড় মর্নিং রণদা, ছুটিতে বেশ জমে গেছ দেখছি—কবে এলে?

রণিত দত্ত গম্ভীর একটু।—কাল রাত আটটা পাঁচে। তুই আজ-কাল রাত সাড়ে দশটার পর বাড়ি ফিরিস নাকি?

—যখন খুশি তখন ফিরি। রাতে দেখা হয়নি বলে সরি। দূর্বার দিকে ফিরল, দু'হাত কোমরে।—এই মেয়ে, এ-বেলা বুঝি বিজুর জন্য ছটফটানি নেই?

দূর্বা মনে মনে বেশ বিরক্ত। শালীনতা বোধটুকু পর্যন্ত নেই। কিন্তু রাগ দেখাবার জায়গা নয় এটা তা-ও ভালোই জানে। বলল, বিজুর আঁকার মাস্টারমশাই এসেছেন, আমি তোমার সঙ্গে একটু গল্প করার জন্যেই আগে এসেছিলাম—

—কি ভাগ্য আমার! হেসে অন্যজনের দিকে ফিরল, টিটকিরির সুরে বলল, ক'দিন ছিলে না শুনলাম, গুরুদর্শনে গেছলে নাকি—তোমার জেপি কেমন আছেন?

রণিত দত্ত গম্ভীর।—ভালো আছেন। তোকে গলায় বকলস বেঁধে নিয়ে যাবার লোক জুটেছে কিনা খোঁজ করছিলেন।

একটুও রাগ না করে রমলা আবার দূর্বার দিকে ফিরল।—রণদার মতে ইণ্ডিয়ার দুটো মানুষ—একজন ছিল আর একজন আছে। যে ছিল সে গান্ধীজী, আর যে আছে সে জয়প্রকাশ। যদি রণদার প্রেমে পড়তে চাস তো ঠেসে জেপি-চরিত মুখস্থ কর—

—আঃ রমলা! করুণার পাত্রী ভুলে গিয়ে চাপা গলায় দূর্বা ধমকেই উঠল।

কিন্তু রমলা সতর্ক অন্য কারণে। নিরীহ মুখ করে রণিত দত্তকে সোফা ছেড়ে উঠতে দেখে তিন গজ দূরে সরে দাঁড়িয়ে চোখ পাকালো।—দেখো রণদা, গায়ে হাত দিলে ভালো হবে না বলছি! সেই মেজাজেই দূর্বাকে ডাকল, এই মেয়ে, চলে আয়—

এই বিড়ম্বনারও অবসান সুমতি ঘরে ঢুকতে। সে জানান দিল, আঁকার মাস্টার চলে গেছে, দূর্বাদিকে আর রণদাকে বিজু ডাকাডাকি করছে।

আর কোনো বাধার অপেক্ষা না রেখে দূর্বা উঠে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে এলো।

॥ ছয় ॥

প্রথম মাসের মাইনের টাকা হাতে পেয়ে দারুণ ভালো লেগেছিল দূর্বার। প্রায় রবিবারেই কিছুক্ষণের জন্য হাজিরা দিয়েছিল বলে নির্মলা সরকার পঞ্চাশ টাকা বেশি ধরে দিয়েছিলেন। দূর্বা মিনতি করে তাঁকে সে-টাকা ফেরৎ দিয়েছে। বলেছে, ভালো লাগে বলে রবিবারেও পারলে খানিকক্ষণের জন্য আসে, আর বিজুও তাতে খুব খুশি হয়। কিন্তু সে-জন্য বাড়তি টাকা হাত পেতে নিলে এ-রকম আসার অন্য মানে দাঁড়ায়। টাকা বাঁচল বলে নয়, এই আন্তরিকতা দেখে কর্ত্রী খুশি। খুশি রণিত দত্তও। পঞ্চাশ টাকা ফেরৎ দেওয়ার কথা তাকে নির্মলা সরকার ছাড়া আর কে বলবে। ঠাট্টার সুরে ওকে বলেছে, আপনারও আমার দশাই হবে, অর্থাৎ কিস্‌সু হবে না।

যা-ই হোক, সেই পাঁচশ টাকা নিয়েই বাতাস সাঁতরে ঘরে ফিরেছিল। দিনকাল যা, পাঁচশ টাকা কিছুই নয়, তা-ও জানে। কিন্তু নিজের রোজগারের পাঁচশ টাকা ভাবা যায় না। এই টাকা দিয়ে সাম্রাজ্য কেনা যায় এ-রকম একটা অনুভূতি।

গত কাল দ্বিতীয় মাসের মাইনে হাতে পেয়েও অতটা না হোক, ভালই লেগেছে। আজ রবিবার। সকাল সকাল উঠেছে। ভিড় না লাগতে বাজারটা সেরে আসবে। রবিবারে বাজারে-বাবুদের ভিড় দেরিতেই হয়। বাজারে গেলে দূর্বা খুব সকালেই যায়। নইলে বাজারের অতি লোভের মাছ-টাছ দেখার মতোই কত জনে যে ওকে দেখে ঠিক নেই। তাতে পয়সা খরচ নেই। গেল মাসের মাইনে পেয়েও ভালো বাজার করেছিল। নিজেরা খেয়েছিল, দাদুকে খাইয়েছিল। আজও সেই রকমই ইচ্ছে। তাছাড়া দায়ও আছে একটু। বিকেলের দিকে রমলা আসবে দাদুর কাছে। ওর নাকি

ভবিষ্যৎ জানা ভীষণ দরকার। ওর নাচ চলছে বটে, কিন্তু নাচেব ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামায় না। ঝোঁকও কমে আসছে! প্রেম-প্রেম কবেই মেয়েটা গেল আর ওকেও জ্বালিয়ে মারল। অনেক দিন ধবে দাত্নর কাছে আসবে আসবে করছিল। দূর্বা যতদিন পারে কাটান দিয়েছে। ওর ওপব বীতশ্রদ্ধ হয়ে রমলা নিজেই শেষে দাত্নকে ফোন কবে আজকের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পাকা করেছে। আসছে যখন, দাত্ন আর কি করবে, আতিথ্যেব ব্যবস্থা দূর্বারই করতে হবে।

তেইশ বছবের জীবনে এই দুটো মাসই শুধু জমার বাক্সে আলাদা কবে তুলে রাখার মতো। চাকরি কবছে বাবা জানে, দাত্নব দেওয়া চাকরি তাও জানে। কিন্তু বাবার সঙ্গে বাক্যালাপ নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া আগেও যেমন ছিল না, এখনো তেমনি নেই। চাকবির খবর শেফালির মুখে শুনেছে। কি চাকবি বা কত মাইনের চাকরি জিগ্যেস করেনি। দূর্বাও বলেনি। মাইনে জানলে মাসেব টাকা আব দেবেই না, সব মদে যাবে। শেফালিও অনেক জেরা করেছে, কিন্তু আসল মাইনে ওকেও বলেনি। ওর মতি-গতি ভালো না, দিদির হাতে টাকা আছে টের পেলেই হাত পাতে। সিনেমা দেখার নেশা এই দু'মাসেই অনেক বেড়ে গেছে। তার ওপর দাত্ন সেদিন বলেছিল, বোনেব হাতে খবরদাব কাঁচা টাকা বেশি দিবি না—রোজ বিকেলে দেখি ঘর তালা বন্ধ করে উনি বেড়াতে বেরোন, বেড়িয়ে ফেরার সময় দুই একদিন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে রেষ্টুরেণ্টে বসে খেতেও দেখেছি। মেয়ে বন্ধু শুনে দূর্বা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। শেফালিকে জিগ্যেস করতে ও চোখ বুজে অস্বীকার করেছে, খিদে পেলে নিজে হয়তো এক-আধ সময় খায়, কিন্তু অন্যকে খাওয়াবার পয়সা পাবে কোত্থেকে? আর রেগে গিয়ে দাত্নকে শকুনি বুড়ো বলে গালাগাল করেছে।

কিন্তু দাত্নর ধারণায় কক্ষনো কোনো ভুল হয় ভাবে না দূর্বা। তাই টাকা দেবার ব্যাপারে আগের থেকেও একটু সতর্ক হয়েছে।

ভালো খায় খাক, ও নিজেও তো সকালে আর দুপুরে কত ভালো খায় আজকাল, তখন বোনের কথা মনে পড়েই। কিন্তু শেফালির সিনেমা দেখার ঝোঁকটাকেই বেশি ভয় ওর। অন্য দিন সুবিধে হয় না, স্কুল থাকে আর দূর্বাও বিকেলের শো ভাঙার আগেই ঘরে ফেরে। কিন্তু শনিবারে স্কুল নেই, সেদিন কি করে কে জানে। জিগ্যেস করলে রেগে ওঠে, অস্বীকার তো করেই। কিন্তু দূর্বার খুব বিশ্বাস হয় না। এই মেয়ের মিথ্যে কথা জিভে আটকায় না। ওর দিকে চেয়ে দূর্বার বেশ ভয়ই হয়। আর দুটো বছর গেলে ওর থেকেও ঢের ভালো দেখতে হবে জানা কথাই। রবিবারে যতক্ষণ বাড়ি থাকে, বছর বিশ বাইশের কয়েকটা ছেলেকে সামনের রকে বসে আড্ডা দিতে দেখে। তাদের জোড়া-জোড়া চোখ ওদের ঘরের জানলায় আটকে থাকে। শুধু দূর্বা জানালায় এসে দাঁড়ালেই ওদের চাউনি চটপট অন্য দিকে ফেরে।

বাড়ির ভাবনা ছেড়ে দিলে দূর্বা এখন অনেক নিশ্চিন্ত। হাতে মাইনেটা পেলে ভালো লাগে ঠিকই, কিন্তু কাজের সঙ্গে টাকাটাকে এক করে দেখে না সে। তখন কেবলই মনে হয় ও যেন কোনো শাপভ্রষ্ট দেবশিশুর সেবায় লেগেছে। অন্তরের দরদ সকলেই টের পায়। ওই ছেলেটা ওকে বেঁধেই ফেলছে। আর দু'দুটো মাস কেটে গেল অথচ একবারও রক্ত দিতে হল না দেখে বাড়ির গিন্নিটিও খুব পয়মন্ত ভাবছে ওকে। আর তার ফুর্তি যে বেড়েছে, সুমতি তো তা পঞ্চমুখে বলে।

এরকম নাকি খুব শিগগীর হয়নি। বাড়ির কর্তা নিখিলেশ সরকারের সঙ্গে কমই দেখা হয়। সকাল ন'টার মধ্যে বেরিয়ে যান, তার আগে পর্যন্ত ব্যস্ত। আর রাত আটটায় তো কোনদিনই ফেরেন না। দেখা যা হয় একটু আধটু সে রোববারে। এত বড় লোক, কিন্তু অমায়িক। প্রথম দিন বলেছিলেন, বিজুর তোমাকে এত পছন্দ সে-জন্য আমরাই তোমার কাছে গ্রেটফুল। ও-বাড়িতে

ওকে দেখলে সেই চিরাচরিত কাঠ-খোট্টা মুখ একমাত্র বড়দি কমলা সরকারের। সেই প্রথম দিন থেকেও বেশি। চোখোচোখি হলেই গম্ভীর, রুক্ষ। নিজের অপরাধ দূর্বা ভালোই জানে। এই মহিলার সম্পর্কে ওরও এখন কৌতূহল কম নয়।

অনাগত দুঃসময়ের ছায়া মনের তলায় একেবারে উকিঝুঁকি দিত না এমন নয়। রাতে ও আর শেফালি এক খাটে শোয়। শেফালির শুতে না শুতে ঘুম। তখন দূর্বার নানা অবাঞ্ছিত চিন্তাও এক একসময় মাথায় আসত। যেমন, যতদিন ওই ছেলের পরমায়ু ততদিন তার চাকরি। রোগ যা, সেটা কতদিন। নিজের ওপরেই রেগে গিয়ে চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে চাইত। বিজুর রোগের থেকেও কি তার চাকরি বেশি? কখনো না! এমন কিছু মন্ত্র বা জাদু তার জানা থাকত যে বিজুর রোগ এক মুহূর্তে ভালো হয়ে যাবে—তাহলে সে চাকরির পরোয়া করত না। তক্ষুণি বিজুকে ভালো করে দিত। তবু বাস্তব এমনি কঠিন বস্তু যে এক একসময় ছায়া পড়তই। এখন সেটাও গেছে। গেছে ওই রণিত দত্তর জন্যেই। অথচ দাদুর মুখে শুনে দূর্বা রেগেই গেছল।

···দাদুর কাছে রণিত দত্ত এখন আগের থেকে একটু বেশি আসে। তাকে নিয়ে দাদু এখন ঠাট্টা-ঠিসারাও শুরু করে দিয়েছে। সেই রণিত দত্তকে দাদু কথায় কথায় বলেছিল, মেয়েটা তো এখন ভালোই আছে, কিন্তু ওই ছেলের কিছু একটা ঘটে গেলে তখন কি হবে সেটাই ভাবনা। তাই শুনে রণিত দত্ত নাকি তক্ষুণি বলেছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সে-রকম হলে ওই মাইনেয় মিস দূর্বার কাজ সরকার মোটরস-এর আপিসেই হবে—আমিই আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি।

শোনামাত্র রেগে গিয়ে দূর্বা দাদুকে বলেছিল, এ-কথা কেন তুমি বলতে গেলে—উনি যদি মনে করেন এই ভাবনার কথাটা আমিই তোমাকে বলেছি?

জবাবে দাছু প্রথমে কটমট করে খানিক চেয়ে রইল। তারপর হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে পেন্সিল-কাটা ছুরিটা নিয়ে নিজের বুকে ছোঁয়ালো।—দেব বসিয়ে? অসতী মেয়ে কোথাকারের—এরই মধ্যে আমাকে বাতিল করে এখন উনি যদি মনে করেন? আস্থক আবার, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে না তাড়াই তো কি বললাম।

রাগ ভুলে দূর্বা হেসে সারা। তারপর বলেছিল, এখানে এলে ঘাড় ধাক্কা না-হয় দিলে, ও-বাড়ি থেকে তাড়াতে পারবে?

কিন্তু সত্যি যা তা সত্যিই। দাছুর মুখে রণিত দত্তর ওই কথা শোনার পরে সেই অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তাটা একেবারে চলে গেছে। ও যেন একটা অন্ধকার বৃত্ত থেকে আলোর বৃত্তে এসে পৌঁছেছে।

রণিত দত্তকে ভালেই লাগে নিজের কাছে সেটা অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু এই ভালো লাগার বিশেষ কোনো সংজ্ঞা নেই। যদিও নিরাপদ তফাতে দাঁড়িয়ে রমলা যা-খুশি তাই বলে। এত খারাপ মুখ কোনো মেয়ের সে দেখেনি। ওদের সামনেই মাকে বলে, রণদা আজকাল এ বাড়িতে বেশি আসছে, বেশি থাকছে কেন? আবার বলে, বিজুর যে দুটো দিন আঁকার মাস্টার আসে, দু'জনেই ওরা সেই দু'দিন আগে আসবে আর বসার ঘরে আড্ডা দেবে—এ কি ব্যাপার!

মা অবশ্য মেয়েকেই ধমকান। বলেন, এরপর ও তোর গায়ে হাত তুললে আমার কাছে নালিশ করতে আসিস না। কখনো বলেন, খামোখা এই মেয়েটাকে লজ্জা দিস কেন? রমলা টেরিয়ে দেখে কতটা লজ্জা পেল। কিন্তু মা কাছে না থাকলে সে এভাবে বড় একটা লাগতে আসে না। সেই এক গাঁট্টা ও বোধহয় জীবনে ভুলবে না।

দূর্বার ভালো লাগে কারণ, মানুষটা একদিকে যেমন সহজ সরল, অন্য দিকে তেমনি ঝোঁকের বশে চলে। কারো কোনো অন্যায় দেখলে সরাসরি বলে দিতে বাধে না। স্বার্থপরতা দেখলে

রেগে যায়। আদর্শের কথা শুনলে ছেলেমানুষের মতো উৎসুক হয় আর খুশি হয়। এ-সব নিয়েও রমলা ঠাট্টা করে। বলে, কেউ কেউ বরাবর নাবালক থেকে যায়, তাদের একজন করে স্পিরিচুয়াল গাইড দরকার হয়, এখানে হাতের কাছে তো আর জেপি নেই, এখানে রণদার সেই ম্যাগনিফায়েড গাইড হলো গিয়ে বড়দা।

বলে রমলা নিজেই হেসে বাঁচে না। ঠাট্টাটা অসারও একেবারে নয়। যে-মানুষ অত মদ খায়, অমন সব জঘন্য বই পড়ে, তার প্রতি এত শ্রদ্ধা দেখে দূর্বারও অবাক লাগে। রণিত বলে আমি বড়দার ভেতর দেখতে পাই—ভেতরখানা তার কি·জিনিস জানেন না। রণিত সকালে বা সন্ধ্যায় যখনই আসুক, কোনদিকে না তাকিয়ে আগে তিন তলায় উঠে যায়। ঘণ্টাখানেক বা আধঘণ্টা বাদে নেমে আসে। আর এ-বাড়িতে থেকে গেলে তার শোবার জায়গাও ওই বড়দাটির ঘরে।

গোড়ার দিকেই রণিত দত্ত নিঃসংকোচে ওকে বলেছিল, আপনার সঙ্গে গল্প করতে আমার ভালো লাগে, আপনি বিরক্ত হন না তো? হলে পরিষ্কার বলে দেবেন।

দূর্বা হেসে জবাব দিয়েছে, বিরক্ত হব কেন।

—যাক, নিশ্চিন্ত। আমি অনেক রকম লোক দেখেছি, বুঝলেন, বেশির ভাগ মনে এক মুখে এক। আপনাকে কেন ভালো লাগে জানেন, আপনি এখানে চাকরি করতে আসেন বটে, কিন্তু চাকরির স্বার্থ থেকে বিজু আপনার কাছে ঢের বেশি হয়ে গেছে।

স্বার্থপরতা কত দু'চক্ষের বিষ তার নজিরও গড়গড় করে দেখিয়েছে। —দাদাদের সঙ্গে আমার ওই স্বার্থপরতার জন্যেই ছাড়াছাড়ি। ভালো সরকারি চাকুরে তারা, আমি জেল খাটা ভাই—সর্বদা ভয়, কখন তাদের চাকরির গায়ে কুলোর বাতাস লাগে—এখন ডাকে, আমি যাই না।

—আপনি জেলও খেটেছেন নাকি? দূর্বা না জিগ্যেস করে পারেনি।

ওমনি হাসি।—বা রে, একবার নাকি, গত চার পাঁচ বছরের বেশির ভাগ সময় তো জেলেই কেটেছে।

দূর্বা চেয়ে রইল খানিক।—আপনাকে দেখলে বোঝা যায় না।··· জেলে খুব কষ্ট হত না?

রণিত হাসল, কষ্ট আর কি, তবে মার-ধর খেতে কার আর ভালো লাগে বলুন—মারের চোটে এক-একসময় চোখে অন্ধকার দেখতে হত।

দূর্বার চোখ বড় বড়।—এ-রকম মারত!

শুনেই কষ্ট পাচ্ছে দেখে রণিতের মজা লাগছে। জবাব দিল না। দূর্বা জিগ্যেস করল, এখন যে শাসন দেখছেন, সেটা কেমন·· ভালো?

সঙ্গে সঙ্গে রাগে বিকৃত মুখ।—ভালো? খেয়োখেয়ি লেগেই আছে দেখছেন না? সব স্বার্থপর। জয়প্রকাশজীর সব আশায় ছাই দিচ্ছে এরা।

এ নামটা প্রায়ই শোনে, তাই দূর্বার কৌতূহল।—জয়প্রকাশজী আপনাকে বুঝি খুব ভালোবাসেন?

—তিনি সকলকেই ভালোবাসেন। দেশকে যে ভালোবাসে তাকেই ভালোবাসেন।—আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ সেই তিয়াত্তর সালে যেবারে তিনি কলকাতায় এলেন সেই বার। তখন আমার বয়স কত আর, একুশ বাইশ—সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছি। কাগজের আপিসে ঢুকেছি। একটা মানুষের মতো মানুষ দেখলাম। পরে শুনেছি, তিনি জ্যোতিবাবু আর সুন্দরায়ার সঙ্গে এক মিটিং করেছেন—সমস্ত বিরোধী দলকে সরকারের বিরুদ্ধে একত্র হওয়ার সেই তাঁর প্রথম প্রস্তাব। তারপর আরো কয়েকবার এসেছেন, আমি প্রত্যেক বার ছুটে গেছি—কাগজের লোক বলে সুবিধেও হয়েছিল। পঁচাত্তর সালে এখানে যে বিশ হাজার লোকের বিরাট মিছিল নিয়ে নিজে তিনি রাস্তায় নামলেন—সেই মিছিলে আমিও

ছিলাম। কিন্তু কি হলো শেষ পর্যন্ত, অতবড় মানুষটা রোগে ধুঁকছেন আর দেশের ভালো চিন্তা করছেন—ওদিকে নেতারা সব যে-যাঁর নিজের স্বার্থ দেখছেন!

এমন জ্বলজ্বলে চোখ যে দূর্বাব কিছু বলতেও সাহসে কুলোচ্ছিল না।

বিজুর কথাই অবশ্য বেশি হয়। কেবল প্রথম দিন দেখেনি, নইলে লাঞ্চ আর তারপর ওষুধ খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে বিজু একটু ঘুমিয়ে পড়েই। সেদিন ওরা সামনেব বারান্দায় চেয়ার পেতে হু জনে গল্প করে। রণিত হু'দিন এখানেই ছিল। অতএব বিজুর চোখ বোজার আগে বা পবে হু'জনকেই চাই।

দূর্বা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, বিজুর জন্য সবাই চিন্তা করে, সবাই ভালও বাসে ওকে, অথচ রাগ হলেই বিজু কেন বলে এ বাড়ির কেউ ওকে ভালোবাসে না?

রণিত দত্ত হেসেই জবাব দিয়েছে, ওই ষোল বছবের ছেলের মাথাখানা আর চোখ হুটো কম পবিষ্কার ভাবেন আপনি? ও ঠিক বোঝে, এক আমি-আপনি বাদে আর সকলে ভালোবাসলেও ওর কাছ থেকে পালাতেও চায়। ..যেমন প্রথমে ধরুন, এ-বাড়ির কর্তা। বরাবরই খুব ব্যস্ত। কিন্তু এক ছেলে গেছে আব এক ছেলেও যাবে ধরে নিয়ে আরো ব্যস্ত। ব্যস্ত থাকা মানেই সব ভুলে থাকা। মাসিমারও তাই, বিকেল হতে না হতে ক্লাবে যাচ্ছেন, না হয়, ফাংশানে মেতে আছেন। ভাই বোনের মধ্যে বড়দা বোধহয় বিজুকে সব থেকে ভালোবাসে—কিন্তু দরকার না পড়লে বা ডেকে না পাঠালে সে ওর ঘর মাড়াবেই না—অথচ এই হুটো ভাইয়ের জন্যেই বড়দা এ-রকম হয়ে গেল। তারপর বড়দি—সপ্তাহে যে হুটো দিন এখানে থাকে তাতেই তার হাঁপ ধরে যায়। এ-কথা আমাকে নিজের মুখে বলেছে। আর রমলাও যে ওকে ভালোবাসে না তা না—বরং ওর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে রোগটাকে উড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু

রোগ যে কি তা-ও জানে, তাই পাঁচ দশ মিনিটও বিজুর কাছে থাকতে পারে না।

দূর্বা এ-দিক থেকে মোটে ভাবেইনি। শোনার পর মনে হয়েছে এ-ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। বাবা মা ভাই বোনের মধ্যে বিজু তার বড়দাটিকেই ভিন্ন চোখে দেখে এ দূর্বা বেশ লক্ষ্য করেছে। কিন্তু রাগ বা অভিমান হলে বিজু তাকেও জড়ায় এই কারণেই হয়তো।

বাড়ির লোকের মধ্যে তু'জনের সম্পর্কে দূর্বার চাপা কৌতূহল এক, বড়দার সঙ্গে বিশাখার ছাড়াছাড়ি কেন—তুই, ভাই বোনের মধ্যে কমলা সরকার এ-রকম কেন। কিন্তু সাহস করে বড়দার সম্পর্কে কিছু জিগ্যেস করতে পারেনি। যে আশ্চর্য স্বভাবের মানুষ ওই বড়দাটি, গা-ঘিনঘিন-করা পর্নোগ্রাফি পড়ার মতোই আবার কিছু শুনে বসবে কিনা জানে না। এখনই আর ওপরে ওঠা দূরে থাক, তার সিঁড়ি দিয়ে নামা-ওঠার সময় ক্বচিৎ কখনো দেখা হয়ে গেলেও মুখের দিকে তাকাতে পারে না।

কমলা সরকারের কথা শুনেছে। ছেলেবেলায় মিশনারি স্কুলে আর তারপরে মিশনারি কলেজে পড়ত। এতগুলো বছর সেখানে এক গোঁড়া ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীর আওতায় ছিল, আর তার দারুণ ভক্তও হয়ে উঠেছিল। এই থেকে ওই রকম। নিজের মা-বাবার ক্লাবে যাওয়া পর্যন্ত বরদাস্ত করতে চায় না। আর ছোট বোনের ওপর তো দারুণ রাগ। মহিলা এখন তার কতটা মাশুল দিচ্ছে মুখ ফুটে সে আর বলার নয়, দূর্বার মুখ শেলাই।

রণিত দত্ত এলে বা এখানে থেকে গেলে অবসর সময় গল্প করাটা সহজ হয়ে এসেছে। কিন্তু রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠলে দূর্বা ভয়ে ভয়ে মুখ বুজে থাকে। কি বলতে কি বলে বসবে ঠিক কি। এই সেদিন ও জব্দ হতে হতে খুব সামলে নিয়েছে। হুম করে ওকে জিগ্যেস করে বসেছিল, মরিচঝাঁপির ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার কি মত?

দূর্বার কাহিল অবস্থা। দণ্ডক না কোথা থেকে এক ঝাঁক রিফিউজি এসে বসেছে সেখানে আর সরকার তাদের ফেরৎ পাঠাতে চায় জানে। খবরের কাগজে তো ওপব-ওপর চোখ বোলায় শুধু এ-বাড়ি এসে। অগত্যা একেবারে বোকা মুখ করে ফিরে জিজ্ঞাসা কবল, কি ঝাঁপি?

—মবিচঝাঁপি। কি আশ্চর্য, এত কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে আব আপনি মবিচঝাঁপিব ব্যাপার জানেন না? কাগজ পড়েন না?

নিবীহ মুখে তুষ্টুমির রাস্তাই ধরল। জবাব দিল, পড়ে কি লাভ, কাবো এক ফোঁটা উপকার করতে পারব? আপনি এত পড়েও আব কাগজেব একজন হয়েও এ-সব ব্যাপারে কিছু কবতে পেরেছেন?

—বা বে, তা' বলে কি হচ্ছে না হচ্ছে জানবেন শুনবেন না?

—তাতে তো শুধু আপনার মতো মেজাজ হবে, আর কি হবে?

রণিত দত্ত হেসে ফেলল, সবটাই ঠাট্টা ধরে নিল।

বাড়িব মধ্যে দূর্বার যাকে নিয়ে সব থেকে মুশকিল সে রমলা। ওকে নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে তার রেষাবেষি লেগেই আছে। নাচ ফাচ অত মাথায় নেই, মেয়ে প্রেম জ্বরে ফুটছে, অথচ প্রেমিক নেই। ফাঁক পেলেই অভাবের সেই হামলাটা করে দূর্বার ওপর দিয়ে। ওর সতর্ক থাকতে হয়। কখন জড়িয়ে ধরে চুমু খাবে ঠিক নেই। ঠোঁট বাঁচানো গেলেও গালের ওপর হামলা। বাড়িতে থাকলে তুপুরে বিজুর ঘুমের ফাঁকে দূর্বাকে ঘরে ডেকে নিয়ে যাবেই। সন্ধ্যায় বা রাতের দিকে ডাকলেও দূর্বা তার ঘর মাড়ায় না। কিছু একটা দরকারি অজুহাতে বিজুর কাছ থেকে নড়ে না। বিকৃতিতে পেয়ে বসেছে মেয়েটাকে। হেসে হেসে দূর্বাকে বলে, যতদিন না মনের মতো প্রেমিক জুটছে ততদিন তুই-ই সম্বল। সেদিন তুপুরে নিজের খাটে শুয়ে রমলা তার কৃতিত্বের গল্প শোনাছিল—কোথায় কোথায় দারুণ রিসেপশন পেয়েছে আজ পর্যন্ত। দূর্বা পাশে বসে শুনছিল। হঠাৎ বাজের মতো ছোঁ মেরে তু'হাতে ওকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে জড়াজড়ি গড়াগড়ি।

গালে মুখে চুমু খাওয়ার চেষ্টা মেয়েটার গায়ে জোরও কম নয়। দু'জনেরই বসন বিস্রস্ত। কোনরকমে ওর হাত ছাড়িয়ে দূর্বা খাট থেকে নেমে এলো। রমলা হাসছে হি-হি-করে।

দূবার বিরক্তির একশেষ।—আমি আর তোমার ঘরে আসছিই না।

রমলাও সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকালো।—তোর ঘাড় আসবে, অত সতীপনা দেখাবি তো থাপ্পড় খাবি। আবার হাসি।—মাইরি বলছি, তুই কাছে এলে তোকে মেয়ে আর নিজেকে ছেলে ভাবতে আমার বেশ লাগে।

রমলা সরকারের বিকৃতি টের পেয়েছে দূর্বা। এটাকে আবার আর এক-রকমের বিকৃতিতে পেয়ে বসছে। কমলার গোপনতা দোসর। রমলার ঝামেলা নিয়েই তার দুর্ভাবনা।

বাজারে গেলে দূর্বা যা কেনার চটপট কিনে ফেলে। দরদস্তুর তেমন করতে পারে না। আজ কি নেবে ঠিক করেই এসেছে। বেশি করে ভালো একটু রুই মাছ, কিছু তপসে মাছ আর কিছু তরকারি। গরম লুচির সঙ্গে সাদা তরকারি, তপসে মাছের ফ্রাই আর রুই মাছের কালিয়া—খাসা অতিথি সৎকার হয়ে যাবে। রমলা প্রায়ই বাইরে খায় কারণ বাবুর্চির রান্না খেতে খেতে ওর নাকি মুখ পচে গেছে। এ-সব ভালোই খাবে।

বাজারে ঢোকার মুখেই থমকাতে হলো। সেই ফুটপাথ ধরে উল্টো দিকে যে লোকটা আসছে আর তাকে এড়ানোর উপায় নেই। অ্যাডভোকেট বাড়ির ছেলে হবু লেখক আর হবু কবি বসন্ত রায়। দু'মাস বাদে দেখা, তাই অভিমানে পাশ কাটানোর বদলে হাসিমুখে কাছে এগিয়ে এলো।

—ভালো আছ?

—মোটামুটি···।

—মোটামুটি কেন, দাছুর কাছে শুনেছি ভালো চাকরি করছ।···ছু'মাস দেখিনি, আমি কিন্তু আগের থেকে ঢের ভালো দেখছি।

মুখের দিকে চেয়ে দূর্বা একটু হাসল শুধু। যে বলল, চাকরি না করা সত্ত্বেও তার চেহারাখানা আগের থেকে কম খোলতাই মনে হলো না। বাজারের গেটে পা বাড়াতে এই লোকও সঙ্গ নিল। নেবে জানা কথাই।

বসন্ত রায় হাসি মুখে জানান দিল, তুমি আমাকে সত্যিকারের শিক্ষা দিয়েছ। এখন কিন্তু আমি চাল ডাল তেল নুন চিনি মাছ তরকারির দর মোটামুটি জানি, আর লেখার মধ্যেও সে-সব আনতে চেষ্টা করছি।

দূর্বা কোথায় কি উঠেছে দেখতে দেখতে নিস্পৃহ মুখে জিজ্ঞাসা করল, লেখা ভালো চলছে ?

উৎসাহে ডগমগ মুখ।—গত ছু'মাসের মধ্যে ছু'টো বড় কাগজে আমার ছুটো গল্প আর ছোট বড় কাগজে পাঁচটা কবিতা ছাপা হয়েছে···তুমি দেখনি সে-সব ? দাছুকে তো কাগজগুলো সব দিয়ে এসেছিলাম।

মনে পড়ল। দাছু বলেছিল, মুখে না বলে গেলেও এগুলো সব তোর জন্য—নিয়ে যা।

দূর্বা উৎসাহ বোধ করা দূরের কথা, ফিরে ব্যঙ্গ করেছিল, টাকার জোর থাকলে আজকাল লেখা ছাপা কিছু কঠিন নয়। এ বেচারাকে সে-রকম বলা যায় না। জবাব দিল, দেখেছি।

পায়ে পায়ে মাছের বাজার চক্কর দিচ্ছে। এক জায়গায় দাঁড়ালো। ভালো বড় তপসে মাছ উঠেছে। কিন্তু বসন্ত রায়ের আর কোনো দিকে চোখ নেই। উদ্‌গ্রীব।—পড়েছ সব ?···যতটা সম্ভব বাস্তব ঘেঁষেই তো লিখতে চেষ্টা করেছি।

তপসে মাছ ছেড়ে দূর্বা তার মুখের দিকে তাকালো। দ্রুত কিছু

একটা মগজের দিকে ধেয়ে আসছে। পাঁচ সেকেণ্ড আগেও এ-রকম চিন্তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

ও-ভাবে চেয়ে থাকার ফলে বসন্ত রায় চুপসে গেল একটু।—পড়োনি ?

পড়া দূরে থাক, দাছুর কাছ থেকে ওই মাসিক সাপ্তাহিকগুলো নিয়ে একবার উল্টেও দেখেনি। দূর্বার মাথা তড়িঘড়ি কাজ করে চলেছে।···রমলা সরকারের ভালো চেহারার ছেলে ভারী পছন্দ। পথ-চলতে সে-রকম কন্দর্পকান্তি কোনো ছেলেকে দেখলে তার নাকি জিভে জল আসে।

বলল, পড়েছি। আমার কিছু বলারও আছে। কিন্তু এই মাছের বাজারে দাঁড়িয়ে আলোচনা হয় কি করে, আমার তাড়াও আছে।

পড়েছে শুনে খুশি। বলার আছে শুনে আরো উদ্‌গ্রীব। বাজারে দাঁড়িয়ে আলোচনা হয় না তা-ও ঠিক। বিমর্ষ মুখে বলল, তুমি যে চাকরি করছ, সকালে বেরিয়ে রাতের আগে ফেরো না—রবিবারেও প্রায়ই বেরিয়ে যাও···আলোচনা কখন হতে পারে···?

দূর্বার মন স্থির। একটু ভেবে জবাব দিল, আজ বিকেলের দিকে দাছুর কাছে এলে হতে পারে···আমি থাকব।

সুন্দর মুখ উদ্ভাসিত একেবারে।—বিকেলে কখন ?

দূর্বা একটু হিসেব করে নিল। রমলার ঠিক চারটেয় আসার কথা। নেচে বেড়ানো মেয়ে সময়ের খেলাপ করে না।—সাড়ে চারটেয় এসো। চা-টা খেয়ে আসতে হবে না, দাছুর ওখানেই খেও, আমি ব্যবস্থা করব।

সকালে কেউ আকাশের চাঁদ হাতে পেলে কারো এমন মুখ হয় কিনা দূর্বা জানে না। এবারে হাল্‌কা হেসে তাড়া দিল, তুমি সামনে থাকলে আমি বাজার করতে পারছি না, এখন সরে পড়ো।

বসন্ত রায় বসন্ত-বাতাসের ঝাপটায় বিহ্বল হয়ে প্রস্থান করল।

দূর্বা বাজার সেরে ফিরল। মনে মনে হাসছে সে-ও। ছক কেটে

—বাড়িতে দেখা আর এই নিরিবিলিতে দেখা কি এক। দেখেই মুণ্ডু ঘুরে গেছে। তা হ্যাঁরে মেয়ে, খুব তো নেচে বেড়াস শুনলাম, তা এখানে একটু কোমর বেঁকিয়ে টেকিয়ে নাচ দেখাবি না?

হেসে উঠে রমলা তক্ষুণি তার দু'কাঁধে দু'হাত তুলে দিয়ে ঢং করে কোমর দুলিয়ে নাচ শুরু করে দিল।

—বাপরে বাপ, ছাড়—ছাড়—এখন দেখছি নিজেকে যত বুড়ো ভেবেছিলাম ততো বুড়ো নই।

শুধু রমলা নয়, দূর্বাও হেসে সারা। খাটের ওপর ধুপ করে বসে পড়ে রমলা বলল, মাস্টারদাদু তুমি এত ওয়াণ্ডারফুল আগে জানতাম না।

দাদুর পরিতুষ্ট মুখ।—সৌরভ কি যত্রতত্র বিলোতে আছে রে। আঙুল নেড়ে দূর্বাকে দেখালো, এ আর কি, ও ছুঁড়ীর সঙ্গে কত রকমের রস হয়।

দূর্বা মুখ ঝামটা দিল, থাক, ঘাটে যাবার আগে পর্যন্ত তোমার রস যাবে না—রমলা যেজন্যে এসেছে সেদিকে মন দাও।

বিরক্ত মুখ করে রমলা তক্ষুণি সমস্যার কথাটা জানালো।—কিন্তু মা-তো আতি-পাতি করে খুঁজেও আমার ঠিকুজি-মিকুজি বার করতে পারল না—পারবে কি করে, কেবল নিজের আর ছোট ছেলেরটাই সব। তাহলে কি দেখবে?

দাদু হাত বাড়ালো।—হাতটাই দে দেখি।

—তুমি হাতও দেখো তাহলে? রমলা খুশি মুখে বাঁ হাত বাড়িয়ে দিল।

—হাতের মতো হাত হলে দেখি। দাদু মনোযোগ দিয়ে হাতের চেটো থেকে কনুই পর্যন্ত বেশ করে টিপে টিপে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল। দুষ্টুমি হচ্ছে বুঝে রমলা চোখ পাকালো, এ কি-রকম দেখা?

দাদু তেমনি হাত টেপায় মগ্ন, কেন, এ-রকম করে দেখে দেখে

ও-ছুঁড়ীর ছুটো হাতই আমি তুলো করে দিয়েছি। তা তোরও বেশ হাত—

দূর্বা ধমকে উঠল, দেখো দাছু, সবসময় ইয়াবকি ভালো লাগে না। তুমি হাত দেখে বলো ওর প্রেমিক কোথায় ডুব মেরে আছে।

এমন করে বলল যাতে দাছু ধরেই নেয়, প্রেমিক একজন আছেই, এবং কিছুদিন সে নিপাত্তা। দাছুও সত্যি সেই গোছেরই কিছু ভেবে নিল। এবাবের ছদ্ম মনোযোগ হাতের রেখার দিকে। নিবিষ্ট একটু। বললেন, ডুব মেবে আর ক'দিন থাকবে, দরজায় ঘা পড়ল বলে।

দূর্বা টুপ করে ঝুঁকে দাছুব হাত ঘড়িতে সময় দেখে নিল। চারটে বাইশ। ওদিকে রমলা উৎসুক।—দেখতে কেমন হবে বলো।

দূর্বা ফড়ফড় করে বলে উঠল, দেখতে কেমন হবে তুমি নিজে জানো না? যেমন তেমন হলে মন ওঠাব মেয়ে তুমি?

দাছুও সঙ্গে সঙ্গে সূতো পেয়ে গেল। রমলা দূর্বার কথায় কান না দিয়ে সাগ্রহে দাছুব দিকে চেয়ে আছে। দাছু ঘটা করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল!—এই জন্মেই আমাতে তোর মন উঠল না, কার্তিক কার্তিক—স্রেফ একখানা কার্তিক! কবেছিস কি রে, আগলে রাখতে পারবি তো?

দূর্বার আর একটু সময় কাটানোর তাগিদ।—ওর বিয়ের আর কত দেরি দেখো তো।

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশা সফল। হাত টেনে নিয়ে রমলা ওকে ধমকে উঠল, এই মেয়ে, বিয়ে নিয়ে তোকে কে মাথা ঘামাতে বলেছে?

মুখ কাঁচুমাচু করে দূর্বা বলল, দাছুর হাত দেখাও তো একেবারে অব্যর্থ—থাক দাছু ও-সব বলতে হবে না। তোয়াজের চেষ্টা, আচ্ছা, ঠিকুজিটা কোথায় যেতে পারে, মাসিমাকে বলে আমিও একদিন খুঁজে দেখব।

—হুঃ! রমলা ঠোঁট বাঁকালো।—ঠিকুজি খোঁজার জন্য তোরা ওই বিচ্ছু ছুলাল তোকে ছেড়ে দেবে।

—যা-ই বলো, বিজু তোমাকে মনে মনে কিন্তু বেশ ভালোবাসে···।

—ছাড তো, ও-সব কথা এখন ভালো লাগে না।

সিঁড়িতে মৃদু পায়ের শব্দ। দূর্বার বুক ঢিপ-ঢিপ। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে বসন্ত রায়ের ফুটফুটে মুখখানা ওরই আগে চোখে পড়ল। দোতলায় উঠে দরজা পর্যন্ত এসে ঘরে আর এক অচেনা মুখ দেখে দাঁড়িয়ে গেল।

তাকে দেখেই দাদু বলে উঠল, কি রে, ঘরে দু'দুটো ডবকা ছুঁড়ী নিয়ে বসে আছি, তুই আবার এর মধ্যে এসে হাজির হলি!

রমলার চোখে হঠাৎ পলক পড়ে না। দরজা থেকে সেই চোখ জোড়া দূর্বার দিকে ফিরতে তার অপ্রস্তুত গোছের মুখ। উঠে দু'পা দরজার দিকে এগিয়ে বেশ নরম করে ডাকল, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভিতরে এসো···আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

অনুমতি পেয়ে বসন্ত রায় সপ্রতিভ মুখে ঘরে ঢুকল। ওদিকে রমলা কানে যেটুকু শুনল তাতেই তার দু'চক্ষু স্থির। একবার ওই ছেলের দিকে তাকায় আর একবার দূর্বার দিকে।

—এই আমার বন্ধু রমলা সরকার···নামটা শোনা থাকার কথা, নাচের জন্য চারদিকে নাম-ডাক। দূর্বা রমলার দিকে ফিরল, আর এর নামও তোমার কাছে নতুন না লাগতে পারে—বসন্ত রায়, লেখক—কবিও।

বসন্ত রায় দু'হাত জোড় করে সবিনয়ে নমস্কার জানালো। রমলার এখনো পলক পড়ে না। বার দুই মাথা নেড়ে নমস্কারের জবাব দিল।

দূর্বা নিজের চেয়ারটা বসন্তকে দেখিয়ে বলল, বোসো। নিজে রমলার পাশে খাটে বসল। আপ্যায়ন দেখে দাদুর কি-রকম লাগছে। কিন্তু দূর্বা তার দিকে তাকাচ্ছেও না। গলার স্বরে একটু উৎসাহ মিশিয়ে রমলাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি বসন্তর গল্প বা কবিতা কিছু পড়েছ?

রমলার চোখে মুখে আফসোস একটু। মাথা নাড়ল, পড়েনি।

—আচ্ছা, আমি তোমাকে দেব'খন। বসন্তর দিকে তাকালো। —তোমার এবারের লেখা গল্প কবিতা সবই পড়েছি।...ভালোই লেগেছে, কিন্তু এখনো একটু স্বপ্ন-দেখা ভাব থেকে গেছে।

বসন্ত রায়ের বিগলিত মুখ, কিন্তু ত্রুটি সরাসরি মেনেও নিতে পারছে না। বলল, যতটা সম্ভব বাস্তব ঘেঁষেই তো লিখেছি...গল্পের কথা বলছ না কবিতার।

—তু'য়েরই। তবে কবিতায় বেশি। অত খিদের মুখে ঘন ছোলার ডাল আর গরম রুটি এনেছ কেন—গলায় আটকে যাবে না?

চোখ গোল-গোল করে দাতু একবার এর দিকে ফিরছে একবার ওর দিকে। সকালে ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে যাওয়াও মনে পড়েছে। ও-দিকে দূর্বার দিকে চেয়ে রমলা যেন অভাবিত কিছু আবিষ্কার করেছে। আবার কবি-লেখকের দিক থেকেও মুখ ফেরাতে পারছে না।

দূর্বা আবার বলল, অবশ্য আমার মতটাই সব নয়, রোসো আগে রমলাকে পড়াই—আমার ডবল বুদ্ধি বিবেচনা ওর, ও কি বলে দেখি, তার আগে কিছু বলব না।

না পড়েই রমলা ফুল মার্কস দিয়ে বসে আছে মনে হলো। বসন্তর মুখে খুশির হাসি দেখে ফুল মার্কও ছাড়িয়ে যাচ্ছে বোধহয়।

দূর্বা উঠে দাঁড়ালো।—এবারে চা আর খাবারের ব্যবস্থা করি—দাতু, হারুকে থাকতে বলে দিয়েছিলাম, আছে তো?

দাতু ওর দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে তু'চোখে নির্বাক একটু মিনতি পেশ করল শুধু। অর্থাৎ, দোহাই দাতু, বেফাঁস কিছু বলে বসে আমাকে ডুবিও না। চলে গেল।

খাবার করাই ছিল। তু'বোনে হাত লাগিয়ে চটপট কিছু লুচি ভেজে ফেলা। ময়দাও মেখে রেডি করা ছিল। মিনিট পনেরর মধ্যে হয়ে গেল। হারুর হাতে ঢাকা বাসনে সব পাঠিয়ে দিয়ে

শেফালিকে চায়ের জল চড়াতে বলে দূর্বা আবার এ-বাড়ির দোতলায়। তার হাতে সাপ্তাহিক আর মাসিকপত্র ক'টা।

গম্ভীর মুখে দাদু কি-কি করা হয়েছে দেখল। দূর্বা খাবার সাজাতে ব্যস্ত। বসন্ত আর রমলা গল্প করছে। খাবার দেখার ছলে দাদু দূর্বাকেই দেখছে। বলল, আমার সঙ্গে ঘর করে তোরও অঙ্কের মাথা খাসা খুলেছে।

দূর্বা সচকিত হয়ে ওদের দিকে তাকালো একবার। না শোনার কথা নয়। দাদু স্বাভাবিকভাবেই বলেছে। ওরাও এ-দিকে তাকালো। কিন্তু দাদুর দৃষ্টি খাবার দেখায় মগ্ন। ওরা ও-ব্যাপারেই প্রশংসার কিছু ধরে নিল। বসন্ত রায় একসঙ্গে অনেক কথা বলতে পারে না। লেখকরা গল্পের প্লট কি করে পায় রমলার জানার কৌতূহল। মুগ্ধ হয়ে শুনছে। দাদুকে একটা ভ্রূকুটি শাসনে ঘায়েল করে দূর্বা খাবার সাজানো শেষ করল।

খাবার ভালো না লাগার কথা নয় রমলার। কম কিছু খেল না। কিন্তু মন বেশি অন্য দিকে। খাওয়ার ফাঁকে আর গল্পের ফাঁকে দূর্বা আর বসন্তকে দেখছে। দূর্বার মনে হলো, মাছ ভাজা চিবুতে চিবুতে দুই চোখে থেকে থেকে ওর মাথাটাও চিবিয়ে নিচ্ছে।

ঠাণ্ডা দু'চোখ বসন্ত রায়ের মুখের ওপর স্থির রেখে দূর্বা জিগ্যেস করল, তোমার উপন্যাস শুরু করছ কবে?

খুশিতে খাবি খাবার দাখিল বসন্তর। ওর ধারণা, মোটামুটি ভালো চাকরি পাবার পর দূর্বাব এই পরিবর্তন। জবাব দিল, ইয়ে··· এ-দিকে আর একটু নাম-টাম করে নিই—

দূর্বা তার মুখের খাবার অল্প অল্প চিবুচ্ছে, কিন্তু সেই রকমই চেয়ে আছে। অর্থাৎ জবাব শুনে একটা ধমক লাগানোর ইচ্ছে। কিন্তু গলা একটুও না চড়িয়ে বলল, লোকে নাম করে উপন্যাস লেখে না, লিখে নাম করে।

অকাট্য যুক্তি। বসন্ত রায় সাগ্রহে সায় দিল, তা তো বটেই, ঠিক

আছে, ভেবে-চিন্তে একটা শুরু করে দেব।···তোমার সঙ্গেও একটু আলোচনা করে নেব।

হুঁঃ, আমার কত সময়।

খাওয়ার পাট শেষ হতেই রমলা উঠে পড়ল। যাবে। মুখখানা সদয় বা প্রসন্ন নয় একটুও। রমলা সঙ্গে সঙ্গে বলল, চলো, বিজুকে কথা দিয়েছিলাম বিকেলে যখন হোক একবার যাব—

রমলার চাউনিও খরখরে। এক-হাত নেবার সুযোগটা যেন সেধে এলো। বলল, চল—

দূর্বা ম্যাগাজিন ক'টা তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, এগুলো নিয়ে যাও, পড়া হলে খবরদাব বাড়িয়ে প্রশংসা করবে না, এমনিতেই ভালো লেখে বলে অহংকার, ঠিক যা মনে হয় তাই বলবে। বসন্তর দিকে ফিরল, তোমার বাড়ির ফোন নম্বরটা রমলাকে দিয়ে দাও, যা-বলার ও নিজেই বলবে, আমার মুখে শুনলে তোমার আবার সন্দেহ থেকে যাবে।

দাছুর টেবিল থেকে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসন্ত রায় তক্ষুণি ফোন নম্বর লিখে রমলার হাতে দিয়ে কৃতার্থ। বলল, তা'বলে আপনার বন্ধুর মন রাখার জন্য যেন সমালোচনার ব্যাপারে বেশি নির্দয় হবেন না।

রমলা অসহিষ্ণু জবাব দিয়ে বসল, আমি কারো মন রাখা-রাখির ধার ধারি না।

দূর্বা সে-কথায় কান না দিয়ে বসন্তকে বলল, তুমিও যাবে তো চলো, নামিয়ে দিয়ে যাই। রমলার দিকে ফিরল, কাছেই, গাড়িতে ছু'মিনিটের পথ—

তকমা পরা অবাঙালী ড্রাইভার পিছনের দরজা খুলে দিতে দূর্বা বসন্তকে বলল, তুমি তো ও-দিক থেকেই নামবে—ওঠো।

যেন ওরই গাড়ি। বসন্ত তাড়াতাড়ি উঠে কোণের দিক ঘেঁষে বসল। দূর্বা তারপর রমলাকে বলল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ওঠো— ?

রমলা উঠে বসন্তর পাশে বসতে দূর্বা এদিকের জানালার ধারে বসে দরজা বন্ধ করল। সামনের আসনে ড্রাইভার একলা। পিছনে তিনজনে যে-ভাবেই বসুক গায়ে গায়ে ঠেকা-ঠেকি একটু হবেই।

গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত বসন্ত রায় বলল, আপনার নাচের এত নাম, কিন্তু আমার দেখা হয়ে ওঠেনি···

রমলা তার দিকে ফিরে একটু হেলে কাঁধে কাঁধ ঠেকল।—কোথায় দেখবেন, ফাংশনে না গেলে?

বসন্ত রায় এখনো জানে না দূর্বার চাকরিটা ওদেব বাড়িতেই। তাই কোথায় দেখা উচিত সেটুকু বুদ্ধি বা বিবেচনা তার আছে। জবাব ছিল, ফাংশনের অ্যাটমসফিয়ার অন্যরকম, সেখানে দেখতেই ভালো লাগবে—

—আচ্ছা, খবর দেব।

অ্যাডভোকেট বাড়িব সামনে গাড়িটা দাঁড়াতে বসন্ত বায় নামল। মস্ত বাড়িটা দেখে আর সামনের গ্যারাজে বড়সড় একখানা গাড়িও দেখে রমলা আর একটু গম্ভীর।

কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ ইত্যাদি জানিয়ে বসন্ত বায় সরে দাঁড়াতে গাড়ি আবাব ছুটল। বমলা মাঝের ফারাক বাড়িয়ে ও-দিকে সবে বসল। দূর্বা সেই ফাঁকে আড়চোখে ওর [illegible] মুখখানা দেখে নিল।

—বাড়িটা ওদেব নিজেব?

—হ্যাঁ।

—গাড়ি?

—বসন্তর বাবার। তিনি হাইকোর্টের মস্ত অ্যাডভোকেট।

—বাড়িতে আর কে আছে?

—ওর বাবা-মা, আর একটা ছোট বোন।

—পড়াশুনা কদ্দূর করেছে?

—কে বসন্ত?

জবাবে কঠিন চোখে রমলা ওর দিকে তাকালো.

দূর্বা তাড়াতাড়ি বলল, বি. এ. পাশ, বাংলায় অনার্স ছিল···

—শুধু লেখে না আর কিছু করে?

—আর আবার কি করবে. বাপের এক ছেলে, অবস্থা ভালো, ওর বাবা, মা-ও চান ছেলে লিখে নাম করুক—দু'নৌকোয় পা দিয়ে তো সে-রকম বড় হওয়া যায় না।

চুপচাপ একটু। তারপরেই ফেটে পড়ল, তুই একটা বেইমান, তুই একটা পাজী, তুই একটা ছুঁচো, বিজুটা ও-ভাবে কলে না পড়ে গেলে আজই তোকে আমি ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে তাড়াতাম—বুঝলি?

দূর্বা মনে মনে অন্তত হাসতে পারত, কিন্তু ড্রাইভার তেমন বাংলা না বুঝলেও ছোট মেমসায়েবের মেজাজ টের পাচ্ছে। ওকে সচেতন করার জন্যেই দূর্বা ড্রাইভারের দিকে তাকালো একবার। তারপর মৃদুগলায় বিস্ময় ঝরালো।—হলো কি হঠাৎ? কি আবোল তাবোল বলছ?

—আবোল তাবোল বলছি? তুই এতবড় শয়তান! প্রেম কাকে বলে জানিস না? ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানিস না? আমাকে বললে আমি তোর কাছ থেকে ওকে কেড়ে নিয়ে গিলে খেতাম?

এতক্ষণে যেন বোঝা গেল ব্যাপারটা। বিস্ময়ের বদলে দূর্বা মুখে বিষাদের ছায়া টেনে আনতে চেষ্টা করল। চোখের ইশারায় ড্রাইভারকে দেখিয়ে মৃদু গলায় বলল, আস্তে, কি ভাবছে ঠিক নেই।···তুমি এমন একটা ভুল করবে ভাবিনি।

—ভুল? কে শুনছে না শুনছে এই মেজাজে রমলা তার ধার ধারে না।—আমাকে কচি খুকী পেয়েছিস? আমার নিজের চোখ নেই? কান নেই?

—তোমার মাথার ঠিক নেই, সব জানলে আমাকে এ-রকম করে বলতে তোমার মায়া হত।

এবারে থমকাতে হলো।—কেন, কি জানার আছে?

গম্ভীর নিচু গলায় দূর্বা বলল, ছ' মাস বাদে আজ হঠাৎ এসে গেল তাই, নইলে প্রেম দূরে থাক, আমি ওর ধারে কাছেও ঘেঁষি না। আমার কাছে ও-বাড়ির দরজা বরাবরকার মতো বন্ধ।

এবারে উৎসুক একটু।—কেন?

—আমরা কত গরিব তোমার ধারণা নেই। ওর বাবা মায়ের ইচ্ছে বড় ঘরের মেয়ে এনে ধুমধাম করে একমাত্র ছেলের বিয়ে দেবে। ছেলেকে তাঁরা শাসিয়েছেন, তাঁদের অবাধ্য হলে বাড়িতে ঠাঁই হবে না। তাঁদের আরো রাগ কারণ আমার সম্পর্কে তাঁদের কাছে কুচ্ছিৎ উড়ো চিঠি গেছে। কিন্তু তবু ছেলেকে বোঝাতে না পেরে—

এখানে থেমে গেল। কারণ এবারে যা বলতে যাচ্ছে সেটুকু সত্যি নয়।—না থাক, তুমি আবার বলে-টলে ফেললে মুশকিলে পড়ে যাব ···।

—আমি আবাব কাকে কি বলতে যাব! ছেলেকে বোঝাতে না পেরে কি হয়েছে?

—কক্ষনো কাউকে বলবে না?

—আঃ! তুই আমাকে বিশ্বাস করিস না?

দূর্বা এবারে যা বলল সে-রকমটা কোনো ছবিতে দেখেছে কি গল্পে পড়েছে মনে নেই। জানালো, ওই মা শেষে ছেলেকে গোপন করে তার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছিল। তাদের ঘর যেন ও ভেঙে না দেয়। একমাত্র ছেলের এতবড় সর্বনাশ যেন না করে। দূর্বা ভিক্ষে দিয়েছে। যে দাছুর থেকে আপনার আর কেউ নেই, তার নাম করে শপথ করেছে, ওই ছেলের কাছ থেকে সে দূরে সরে থাকবে—এর আর নড়চড় হবে না।

রমলা বিমূঢ় খানিকক্ষণ।—সত্যি সত্যি সরে থাকতে পারবি?

—পেরেছি।

—তুই ওকে ভালোবাসিস না?

—আমাদের মতো গরিবের ও-সব বিলাস মানায় না।

রমলা ওর দিকে চেয়ে ওপরের দাঁতে করে নিচের ঠোঁটে আঁচড় কাটতে কাটতে ভাবছে কিছু।—ধর ওই বসন্ত যদি আর কারো প্রেমে পড়ে যায় বা সে-রকম কিছু হয়, তুই সহ্য করতে পারবি?

—আমি বেঁচে যাব। ওর পার্টস আছে, সত্যি হয়তো একদিন মস্ত লেখক হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার জন্য এখনো সে-ভাবে লেখায় মন দিতে পারছে না। তুমি যা বললে তা যদি হয় আমি সব থেকে খুশি হব। তখন ঠাণ্ডা মাথায় লেখায় মন দিতে পারবে।

রমলার হাব-ভাবে আর রাগের চিহ্নমাত্র নেই। দাঁতে করে ঠোঁটে আঁচড় কেটেই চলেছে, আর থেকে থেকে চোখ বেঁকিয়ে ওকে দেখছে। হঠাৎ ওর দিকে ঘুরে বসে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, তোর দাহু সত্যি কি-রকম জ্যোতিষী রে?

—দারুণ দারুণ! দূর্বার চোখে মুখে এবারে অকৃত্রিম উৎসাহ।—মুখ ফুটে একবার যা বলে একেবারে অব্যর্থ, তার আর নড়চড় হয় না।

রমলার ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি ঝুলছে। গা ছেড়ে এবারে পিছনের গদিতে মাথা নাড়ল।

দাহুকে দিয়ে কায়দা করে যা বলানো হয়েছে দূর্বার অন্তত ভোলার কথা নয়। দাহু বলেছে, রমলার প্রেমিক মানুষ ডুব মেরে আর ক'দিন থাকবে, দরজায় ঘা পড়ল বলে। আর দূর্বার কাছ থেকে আভাস পেয়ে দাহু কিচ্ছু না জেনেই বলেছে, ঘা দিতে আসছে যে সে একখানা কার্তিক—তাকে আগলে রাখা সহজ হবে কিনা দাহুর সেই দুশ্চিন্তা।

দূর্বা নিশ্চিন্ত। দাহুর ভবিষ্যতবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাওয়ার সূচনা দেখছে রমলা সরকার।

॥ সাত ॥

এরপর ধৈর্য ধরে দিন-কতক দূর্বাকে একটু ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। পর দিনের মধ্যেই রমলা বসন্তর গল্প দুটো আর কবিতা তিনটে পড়ে ফেলেছে। তার খুব একটা ভালো লাগেনি বোঝা গেছে। দূর্বাকে বলেছে, তোর এত বড় লেখকের গল্পে আর কবিতায়ও এত টাকাকড়ি আর দরাদরির হিসেব কেন?

দূর্বা ঠাণ্ডা জবাব দিয়েছে, গরিবের মেয়ের মুখ চেয়ে লিখেছে, তোমার পছন্দ না হয় বলে দাও—

—বলবই তো, আমি কারো পরোয়া করি!

কি বলেছে দূর্বা জানে না। ওর কাঁধে প্রেমের ভূত চাপিয়ে দিতে পেরে নিশ্চিন্ত। দুপুরেব নিরিবিলিতে আর ওর ডাক পড়ে না. ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা দেড়েক ফোন কানে নিয়ে বসে থাকতে দেখে। বিকেল চারটে না বাজতে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। দূর্বা মুখ দেখেই বুঝতে পারে লেকে বা আর কোথাও অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট।

আবার একদিন হেসে বলল, তোর লেখকটা হাঁদা নাকি রে— যা বলি তাতেই সায় দেয়।

দূর্বা গম্ভীর।—আমার লেখক—আমার লেখক কোরো না···তা তোমার মতামতটা কি কম কিছু নাকি?

রমলা এখন অকারণ খুশিতে ওকে জাপটে জাপটে ধরে। সেদিন তো হেসেই বাঁচে না।—লেখক যে তাঁর উপন্যাসের প্লট ঠিক করে ফেলেছে রে! নায়িকা একজন অ্যারিস্টোক্রাট্ ড্যান্সার। কি-রকম হবে বল্ তো?

দূর্বা নির্দ্বিধায় জবাব দিয়েছে, তুমি সাহায্য করলে রিয়েল হবে আর সত্যিকারের ভালো হবে।

—সত্যি বলছিস? আনন্দে হাবুডুবু।

—আমার মিথ্যে বলে লাভ কি। আমি তো জানি সে-ভাবে চালাবার কেউ থাকলে ও একদিন নাম করবে।

ওদের প্রেম যত জমাট বাঁধছে দূর্বা ততো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে। বিকৃত হামলার হাত থেকে বেঁচেছে। এই প্রেমের ব্যাপার নিয়ে এখন ওর কাছেও বেশি ঘেঁষে না। সম্ভবত চক্ষু লজ্জায়। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যে রণিত দত্তই হঠাৎ একদিন দূর্বাকে জিগ্যেস করল, আচ্ছা, রমলা নাকি কে একটা ছেলের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করছে যার জন্য বড়দি খুব অসন্তুষ্ট…আব সেই ছেলেকে নাকি আপনি চেনেন?

দূর্বা থমকালো একটু।—বড়দি জনলেন কি করে?

—পর পর দুই রোববার সেই ছেলেকে এখানে নিজের ঘরে এনে সমস্ত দুপুর ধরে গপ্প-সপ্প করেছে, নাচ দেখিয়েছে।…স্কুলের কিছু মেয়ে নিয়ে একদিন লেকে বেড়াতে গেছল, সেখানেও নিরিবিলি কোনো গাছতলায় কি-রকম ভাবে ওদের বসে থাকতে দেখেছে। এই নিয়ে বোনের সঙ্গে বড়দির ঝগড়া হতে ও নাকি সাফ বলে দিয়েছে, কি-রকম ছেলের সঙ্গে মিশছে আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে পারে।

একটু চুপ করে থেকে দূর্বা বলল, একদিন দাদুর বাড়িতে রমলার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল, ভদ্রলোক আমাদের এলাকার লোক, তার সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনিনি।…তবে রমলা কতটা মিশছে না মিশছে আমি জানি না, জানার দরকারও নেই।

রণিত দত্ত বলল, মুশকিল হয়েছে বড়দি এ-নিয়ে মাসিমাকেও যা-তা বলেছে।

দূর্বা এ নিয়ে আর কথা বাড়াল না। বড়দি এ-ব্যাপারে ওকে একটি কথাও বলেনি। কোনো কথাই প্রায় বলে না। কিন্তু হাব-ভাবে তার আচরণ যে সদয় নয় এটুকু বুঝতে পারে।

পরের দুটো মাসই বিজুর খুব ভালো গেল না। এই দু'মাসে দু'বার রক্ত দিতে হলো। শরীর খারাপ হলে বিজু আগে থাকতে বুঝতে পারে। দূর্বা ভালো করে বোঝার আগে দু'বারই সে ওকে বলেছে, শরীর ভালো লাগছে না—বড়দাকে খবর দাও।

শুনে প্রথম বারে অন্তত দূর্বা দারুণ ঘাবড়ে গেছল। কিন্তু ছুটে যেতে গিয়েও থমকেছে। সুমতিকে তক্ষুণি পাঠিয়েছে খবর দিতে। শোনামাত্র বড়দা নেমে এসেছে। পালস্ দেখেছে। সমস্ত শরীর পরীক্ষা করেছে। এই বড়দার ওপরেই বিজুর যা-একটু অভিমান, বলেছে, অনেকক্ষণ ধরেই একটু একটু খারাপ লাগছিল—

—তাহলে আগে খবর দিসনি কেন?

—কেন দেব? ঠিক-ঠিক খারাপ হয়েছে শুনলেই তুমি আস—নইলে এ-ঘরে ঢোকো কখনো?

জবাব না দিয়ে বড়দা ঘর থেকে চলে গেল। দু'মিনিটের মধ্যে আবার নেমে এলো। হাতে ছোট্ট কালো ব্যাগ একটা। সেই ব্যাগ খুলে তিন মিনিটের মধ্যে বিজুর ভেন থেকে রক্ত টেনে কাঁচের টিউবে রেখে ছিপি এঁটে ব্যাগ বন্ধ করল। একটি কথাও না বলে নিচে নেমে গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। এক ঘণ্টার আগেই ফিরল।

তারপর বিজুকে নিয়ে হাসপাতালে। সেখানে ওর জন্য একটা কেবিন ঠিক করাই থাকে। দূর্বাও এসেছে। নির্মলা সরকারও। দূর্বার বুকে তলায় ঠক-ঠক কাঁপুনি। বিশাখা ব্যানার্জীর তৎপরতায় রক্ত দেওয়া শুরু হতে খুব সময় লাগেনি। খবর পেয়ে বিকেলের মধ্যে বিজুর বাবা এসেছেন, রণিত দত্ত এসেছে, বিজুর বড়দি আর ছোড়দিও এসেছে। ঘরের ভিতরে একবার করে বিজুকে দেখে সকলেই বাইরে এসে বসছে। ঘরে কেবল বড়দা, হাসপাতালের ডাক্তার, রণিত দত্ত আর বিশাখা ব্যানার্জী। অনেকক্ষণ বাদে বড়দা বাইরে এসে দাঁড়াল। পায়চারি করল খানিক। তারপর দূর্বার দিকে চোখ গেল

তার। চুপচাপ খানিক চেয়ে থেকে কাছে এসে বলল, কিচ্ছু ভয় নেই, ঠিক হয়ে যাবে।

বুকের তলার অনেক্ষণের একটা জমাট-বাঁধা ত্রাস সরে যেতে লাগল। এই মানুষের আশ্বাসে কত যে জোর এই প্রথম অনুভব করছে। এরা সব বিজুর এ-রকম শরীর খারাপ হওয়া আর রক্ত দেওয়া দেখে অভ্যস্ত বোধহয়। সকলেই বিষণ্ণ বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দূর্বার মতো কেউ এত ছটফট করছে মনে হয়নি। কিন্তু বড়দা ওর ভিতরের অবস্থা টের পেল কি করে সেটাই আশ্চর্য।

তৃতীয় দিনে বিজুকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হলো। রিঅ্যাকশন দেখার জন্য রক্ত দেবার পর দু'দিন ওকে হাসপাতালেই রাখা হয় শুনল। সেই দু'রাত দূর্বাও এখানেই কাটিয়েছে। বরাবর রণিত একা থাকে। বিজুর বায়না এবারে দূর্বাদিও থাকবে। বায়না না করলেও দূর্বা থাকতে চাইত। কিন্তু সকলের মধ্যে দেখা গেল শুধু বড়দি কমলারই সেটা পছন্দ নয়। সে বাধা দিল, দু'জনের থাকার কি দরকার—

বিজুর কেবিনের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। নিখিলেশ সরকার চলে গেছেন। তাঁর গাড়িতে বড়দা আর রমলাও। নির্মলা সরকার আর কমলা সরকারের জন্য অন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে। বড়দির কথায় রণিত তক্ষুণি সায় দিল, না দু'জনের থাকার কিচ্ছু দরকার নেই। একজন নার্স তো ঘরে থাকবেই।

দূর্বার হঠাৎ কি-রকম রাগ হয়ে গেল। কিন্তু প্রকাশ করাটা অশোভন হবে জানে। রণিতের দিকে ফিরে বলল, নার্স থাকবে যখন আপনিই চলে যান—আমি আছি—বাড়ি গিয়ে একটা ফোন করে দাদুকে শুধু বলে দেবেন আমার বোনকে ডেকে যেন জানিয়ে দেয়।

বিশাখা ব্যানার্জী চুপচাপ দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল। এবারে বড়দির দিকে ফিরে সে বলল, বিজু চাইছে যখন, ওরা দুজনেই থেকে গেলে তোমার কি অসুবিধে?

শুনে দূর্বা সত্যিকারের আনন্দ পেল। জবাব না দিয়ে কমলা তার মা-কে শুধু বলল, চলো—

কেবিনের সামনে ঢাকা বারান্দায় বিশাখা ব্যানার্জী একটা ইজি-চেয়ার আনিয়ে দিয়েছে। ক্যাবিনে আর একটা ইজিচেয়ার আছে। যে-যেখানে খুশি থাক। বিজুর সমস্ত রাত ওষুধের ঘোরেই কেটে যাবে।

বাড়ি থেকে দু'জনের রাতের খাবার আসবে ভেবেছিল দূর্বা। কিন্তু এ-ব্যবস্থাও বিশাখা ব্যানার্জীই করল দেখা গেল।

দু'দিনই সকালে রণিত দত্ত আগে দূর্বাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। বাড়ির লোক আসতে সে নিজে গেছে। তার কথা-মতো দূর্বা খেয়ে দেয়ে দুপুরে বিশ্রাম করে বেলা চারটের মধ্যে চলে এসেছে। রণিত ও তার আগেই হাজির।

তাদের কারোই করার কিছু নেই। যেটুকু করার বিশাখা ব্যানার্জীই করছে। ঘুরে ফিরে অনেকবার করে আসে সে। বিজুর সঙ্গে হেসে বেশ ইয়ারকি ঠাট্টাও করে। বিজু বিরক্ত হয় না, মজা পায়। পরদিন সন্ধ্যায় বাড়ির লোক চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে নিজে ওর বিছানা-পত্র টান-টোন করে দিয়ে হেসে বলেছিল, তোর জন্য কত করি আমি, এখনো ভেবে দ্যাখ আমাকে বিয়ে করবি কিনা।

বিজুর রাগ করা দূরে থাক, বেশ মজা পায়। হেসে তক্ষুণি জবাব দিয়েছিল, তোমার মতো কালো কুচ্ছিৎ ঢেপসিকে আমি বিয়ে করতে গেলাম আর কি।

বিশাখা ব্যানার্জী কালো বটে, কিন্তু কুচ্ছিৎ তো নয়ই, মোটাও নয়। কালো মুখের শ্রী আর শরীরের আঁট বাঁধুনি বরং চোখে পড়ার মতো। বিশাখা ব্যানার্জীও হেসেই চোখ পাকিয়েছিল।—তুই এত বেইমান!

দু'রাতের মধ্যে রণিত দত্তর সঙ্গে দূর্বার কটা কথা হয়েছে হাতে গোনা যায়। কিন্তু ভয়াল ব্যাধি থেকে একটা ছেলেকে টেনে তোলার

তাগিদে এই লোকের সঙ্গে একাত্ম বোধটুকু দূর্বার বুকের তলায় অনেকবার মুখর হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় বার আবার রক্ত দেওয়া হয়েছে পরের মাসের মাঝামাঝি সময়ে। এবারও উনিশ-বিশ সেই একই ব্যাপার। দূর্বার ভীষণ খারাপ লেগেছে বটে, কিন্তু প্রথম বারের মতো অতটা কাঠ হয়ে যায়নি। রণিত দত্ত কতটা পারে জানে না। কিন্তু একটা অমোঘ কিছু মেনে নেবার মতো নিরাসক্ত হতে পারা যে কত কঠিন এটুকু অনুভব করেছে। রণিত বলেছিল, এমনি রক্ত দেবার ফারাক কমতে কমতে এক সময় আর করার কিছু থাকে না। দূর্বার অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠেছিল. চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করেছিল, তা হবে না, কক্ষনো হবে না—হতে পারে না!

রাত এগারোটা হবে। বিজুর কেবিনে সবুজ আলো জ্বলছে। বিজু ঘুমে অচেতন। রক্ত দেবার পর গতকাল থেকে আজ অনেক ভালো। আশা করা যায়, গতবারের মতো আগামী কালই ওকে নিয়ে ঘরে ফেরা যাবে। নার্স বিজুর বেডের পাশে একটা চেয়ার টেনে বোনা নিয়ে বসেছে। বাইরের লম্বা বারান্দার প্রায় সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেবল দু'মাথায় দুটো জ্বলছে। ফলে বারান্দাটা অন্ধকার নয় বলা যেতে পারে শুধু।

দূর্বা পায়ে পায়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো। প্রথমে মনে হলো, বারান্দার ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে রণিত দত্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরে ফেরার আগেই সাড়া পেল, বলবেন কিছু?

—না। এমনি এসেছিলাম···আপনার ঘুম পাচ্ছে না?

হেসে সোজা হয়ে বসল।—এখানে এসে কেউ ঘুমোতে পারে? তার থেকে আপনি এ-চেয়ারটায় এসে বসুন, খানিকক্ষণ গল্প করা যাক।

—না না, আপনাকে উঠতে হবে না। দূর্বা এগিয়ে গিয়ে রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

রণিত বলল, আপনি কিন্তু সত্যি মিছিমিছি কষ্ট করছেন, বিজুর জন্য রাতে ঘরে থাকার কারো দরকার হয় না। তাছাড়া বউদি তো আছেই, তার হেপাজতে এনে ফেলতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

মৃদু গলায় দূর্বা জবাব দিল, বিজু তো চায় থাকি।

—তা চায় অবশ্য। হাসল।—অথচ আশ্চর্য দেখুন, আমরা দু'জনে ওর কেউ না, অথচ শুধু আমাদের দুজনকেই চায়।

দূর্বা কিছু বলল না। লজ্জাও পেল না। এই ছেলেকে উপলক্ষ করে সেই একাত্মতাবোধটুকু আরো নিবিড়।

রণিত দত্ত অস্বস্তি বোধ করছে।—কিন্তু আপনি দাঁড়িয়েই থাকবেন?

—এ-ই ভালো লাগছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ সে-ও হাসল একটু। বলল, বড়দি কিন্তু চান না রাতে আমি এখানে থাকি···

এবারে অবশ্য রাতে থাকার ব্যাপারে কমলা সরকার ওকে কিছু বলেনি। কিন্তু এবারে অর্থাৎ আজই বিকেলে রমলা বসন্ত রায়কে সঙ্গে করে ভাইকে দেখতে এসেছিল। তার সমস্ত মুখ তখন রাগে থমথম করছিল। আর মাঝে মাঝে উষ্ণ চোখে দূর্বাকে দেখছিল।

সোজা ওর মুখের দিকে চেয়ে রণিত দত্ত হাসতে লাগল। বলল, বড়দির নীতির চোখ যে, আপনি থাকলে আমার যে বেশ ভালো লাগে এটুকু বুঝেছে।

বড়দির নীতির চোখ শুনেই ভেতরটা চিড়বিড় করে উঠেছিল দূর্বার। কিন্তু পরেরটুকু কানে যেতেই মুখে লালের ছোপ। অথচ এমন অনায়াসে বলল যে লজ্জা পেতেও লজ্জা। চোখে চোখ রেখে ওরও সহজ হবার চেষ্টা।

তারপরেই সচকিত একটু। বিশাখা ব্যানার্জী আসছে। রাতে শুতে যাবার আগে বিজুকে একবার দেখে যাবে জানা কথাই। কিন্তু দূর্বার খেয়াল ছিল না। কালো মুখে মৃদু মৃদু হাসি। নিঃশব্দে

বিজুর কেবিনে ঢুকে গেল। দু'মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে ওদের কাছে একটু দাঁড়াল।—কি গল্প হচ্ছে ?

রণিত জবাব দিল, এমনি কথা কইছিলাম, তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোওগে যাও—

বিশাখা ব্যানার্জী সুন্দর করে ভুরু কোঁচকালো একটু।—আমি থাকলে এমনি কথা কওয়ায় অসুবিধে হচ্ছে বুঝি ?

হাসতে হাসতে চলে গেল। এটা হাসপাতাল। কেবিনে এমন একজন রোগী। এ-ধরনের হাসি কৌতুক এখানে সাজে না। তবু দূর্বা অস্বীকার করতে পারবে না তার ভালো লাগছে। বিশাখাদি যেন গুমোট বাতাস আরো কিছুটা হাল্‌কা করে দিয়ে গেল।

সে ও-দিকের বাঁকে আড়াল নিতে দূর্বা ভিতরে ভিতরে আবার একটু নাড়াচাড়া খেল। ইজিচেয়ারের মানুষটা আত্মবিস্মৃতের মতো তার দিকে চেয়ে আছে।

অন্য প্রসঙ্গে ফেরার তাগিদে দূর্বা বলল, একটা কথা ভেবে আমার খুব অবাক লাগে···

রণিত আত্মস্থ একটু।—কি ?

—এই বড়দা আর বিশাখাদির ব্যাপারটা। আপনার মতে তো বড়দার মতো এমন মানুষ হয় না, আর এ-দিকে বিজুর জন্য বিশাখাদিও কত করেন—এ-সময় বড়দা পর্যন্ত তাঁর ওপর সব থেকে বেশি নির্ভর করেন। অথচ এঁদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল কেন ?

রণিত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, কালের হাওয়ায় ছাড়াছাড়ির বিষ ঢুকেছে, তাই হলো।

দূর্বা জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইল।

রণিত নিঃসংকোচে বলল, বিশাখা বউদি হাসপাতালের চাকরি রেখেই নামকরা ডাক্তারের বউ হবে এই ইচ্ছে বরাবর ছিল, এখনো আছে। বড়দার খুব বড় হবার স[illegible] কম ছিল না আপনাকে তো বলেছি। তাকে বিশাখা বউদি [illegible]েই বশ করতে পেরেছিল।

বড়দা আমাকে নিজে বলেছে, বিয়ের আগে তার সঙ্গে তিন চার দি
এক ঘরে রাত কাটিয়েছে।

অল্প আলোয় দূর্বার টকটকে লাল মুখ দৃষ্টি এড়ালো না রণিতের
একটু হেসে আবার বলে গেল, বিয়ের পরেও খারাপ কাটছিল না
সুজন মারা যাবার পর থেকেই গণ্ডগোলের শুরু। বড়দা
প্র্যাকটিসে মন নেই, এম. ডি. দিল না, মদের মাত্রা বাড়ছে। আ
বিশাখা বউদিরও মেজাজ চড়ছে। বিজুর অসুখ ধরা পড়তেই বিশাখ
বউদির বড় ডাক্তারের বউ হবার আশায়ও জলাঞ্জলি। বড়দ
প্র্যাকটিস একেবারে ছেড়েই দিল। মদের মাত্রা আরো চড়ল
তার সঙ্গে ওই সব নোঙরা বই এনে পড়া। কিন্তু বড়দার একরোখ
মেজাজ। বউদির সঙ্গে ঠোকাঠুকি বেড়েই চলল—কিছু বলতে
গেলে বড়দা যা-তা বলে দেয়। ব্যস, তারপর নিঃশব্দে ডিভোর্স
দু'জনার।

একটু চুপ করে থেকে রণিত আবার বলল, এখন আবার আর
একজন নামী ডাক্তারের সঙ্গে প্রেম-পর্ব চলছে বিশাখা বউদির—
বড়দাও জানে।...সেই ভদ্রলোকও ডিভোর্সি...দু'জনার বিয়েও হয়ে
যাবে হয়তো। কিন্তু আমার ধারণা, বিশাখা বউদি এখনো বড়দাকেই
ভালোবাসে, তা না হলে বিজুর জন্য তাঁর এত দরদ থাকত না।

•

পরের মাসটা ভালোয় ভালোয় কেটে যেতে দূর্বা হাঁপ ফেলে
বাঁচল। কেস খারাপ হতে থাকলে রক্ত দেবার সময় এগিয়ে আসে
শুনেছিল। গত দেড় মাসের মধ্যে বার দুই তিন বিজুর শরীর খারাপ
হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ত দিতে হয়নি।

তার পরের মাস অর্থাৎ উনআশির জুলাইয়ের গোড়া থেকেই
সূচনা শুভ নয়। নানা দিক থেকে ঝড়ো সমুদ্রের এলোপাথারি
ঝাপটা এসে পড়তে লাগল।...রণিত দত্ত তার কাগজের এত সাধের
চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বসল। এই দিনেও লোকটা একটা আদর্শ

সামনে রেখে চলছিল। নইলে ওই কাগজের আপিসের মাইনে সর্বসাকুল্যে হাজার টাকাও নয়। নির্মলা সরকারের কথা শুনে তাঁদের কারবারে ঢুকলে শুরুতে তার ডবলেরও বেশি টাকা পেতে পারত। কিন্তু নিজের স্বার্থ তুচ্ছ করে ওই কাগজে কলম নামে একটা ঝাঁটা হাতে করে বসেছিল। অন্ধকারের গহ্বর থেকে দুর্নীতি আর পাপ টেনে বার করত। কলমের ঝাঁটায় সে-সব লোকের চোখে তুলে ধরত। এ ব্যাপারে তার প্রধান প্রেরণা-দাতা সবুজ রঙ্গের আধ-বয়সী সম্পাদক মহেন্দ্র চক্রবর্তী। ওই লোকের সম্পর্কে ইদানীং অনেক রকমের কুৎসা কানে আসছিল, কিন্তু রণিত দত্তর বিশ্বাসে ফাটল ধরেনি। কারণ, গুরুর মতো এই ভদ্রলোকই তাকে টেনে এনেছিল, আর এই নির্মম গোছের সংস্কারের মন্ত্র তার কানে জপে দিয়েছিল। নিজস্ব ডকুমেণ্ট অ্যালবাম করার জন্য যে-সব বাতাস-বিষানো মেয়েদের ছবি ভদ্রলোক তার কাছ থেকে চেয়ে নিত, তার পিছনে বিকৃত রুচি রণিতের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। বিপাকে-পড়া সেই তরুণী প্রোফেসারের কুৎসিত ব্যাপারটা সবুজ রঙ্গে আজও ছাপা হয়নি। রণিত তাগিদ দিতে মহেন্দ্র চক্রবর্তী বলেছিল, দাঁড়াও, কলেজে পড়ায় মহিলা, আট-ঘাট না বেঁধে নামা ঠিক হবে না।

কি ছাপা হবে না হবে তা সম্পাদকের বিবেচনার ব্যাপার। রণিতের বলার কিছু নেই। কলেজে পড়ায় যে, তার বিকৃত দিকটা আলোয় টেনে আনা হচ্ছে না দেখে ভিতরে ভিতরে একটু ক্ষোভ ছিল রণিত দত্তর। এর মধ্যে দু'দুজন সহকর্মীর মুখে খবর পেল, ওই রমণীটিকে নিয়ে সম্পাদক নিজেই এখন রঙে রসে মেতেছেন। তারা স্বচক্ষে ওঁদের ট্যাক্সিতে হাওয়া খেতে দেখেছে, ইংরেজি সিনেমা হলেও দেখেছে। রণিত দত্ত ভিতরে ভিতরে গুম হয়ে ছিল। গত সপ্তাহে রাত সাড়ে দশটায় কাগজের আপিস থেকে মেসে ফেরার সময় নিজের চোখে একই ব্যাপার দেখেছে। ট্র্যাফিক লাইটে ওদের

ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে গেছল।…দু'জনে ঘেঁষা-ঘেঁষি বসে, মহেন্দ্র চক্রবর্তীর এক হাত মহিলার কাঁধের ওপর।

পরদিন আপিসে এসে রণিত দত্ত সোজা সম্পাদকের ঘরে ঢুকেছে। জিগ্যেস করেছে, সুলতা ঘোষের স্টোরিটা কাগজে ছাপা হবে কি হবে না। ভদ্রলোক সাফ জবাব দিয়েছে, হবে না।

রণিত দত্ত সেই দিনই রিজাইন করে চলে এসেছে। বাড়ির কেউ কিছু এখনো জানে না। জানলে নির্মলা সরকার অন্তত খুশি হবেন। সে কেবল দূর্বাকে বলেছে। মেসেও থাকছে না। এ বাড়িতেই আছে। বিজু খুব খুশি।

সব শুনে দূর্বারও সত্যি মন খারাপ হয়ে গেছল। লোকটা যেন বড় রকমের কিছু পুঁজি খুইয়ে বসে আছে। দূর্বার মনের ওপর পরের ধাক্কাটা এলো এ-বাড়ির বড়দি কমলা সরকারের কাছ থেকে। কোনো কারণে স্কুল ছুটি কিনা জানে না। তিন চারদিন হলো বাড়িতেই আছে। দুপুরে হঠাৎ হঠাৎ এক-একবার ঘর থেকে বেরোয়। বারান্দায় রণিতকে আর ওকে গল্প করতে দেখলে গম্ভীর মুখে আবার ঘরে চলে যায়। দেখলেও রণিত খেয়াল করে না। বড়দিকে সে একরকমই দেখে। কিন্তু দূর্বা তফাৎ বোঝে। ছোট বোনের কারণে বড়দিটি দূর্বার ওপরেই বেশি ক্ষিপ্ত সম্ভবত। রমলার প্রেম-পর্ব এখন তুঙ্গে চড়ে আছে। নাচিয়ে নায়িকাকে নিয়ে বসন্ত রায়ের উপন্যাস এখন শেষের দিকে। ফলে রমলার এখন নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। পনের দিন হলো ভালো হোটেলের একটা ঘর ভাড়া করেছে রমলা। এমন লেখা বাড়িতে বসে হয়, না সে-রকম আলোচনা করা যায়? ফলে চান-টান করে সকাল আটটার মধ্যে রমলা সেই হোটেলে চলে যায়। ফেরে কোনদিন রাত আটটায়, কোনদিন ন'টায়। ও-দিক থেকে ঘড়ি ধরে বসন্ত রায় আসে। লেখকের জন্য এত দরদ সে-ও কি কোনো মেয়ের দেখেছে? তাছাড়া প্রতিটি সেনটেন্স রমলার মনে ধরলে তবে তো লেখা। খুশি ডগমগ

হালছাড়া মুখ রমলার, বড় লেখক না ছাই, কিচ্ছু যদি নিজের মাথায় কুলতো। আবার কেমন বড় লেখক জানিস, ঘণ্টায় ঘণ্টায় চুমু না খেলে তার কলমে লেখাই আসে না।

…কমলা সরকার এরই মধ্যে একদিন দাদুর কাছে গেছল। দূর্বাকে দাদুই বলেছে। ভাইয়ের ঠিকুজি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ভাইকে নিয়ে যত চিন্তা, বোনের জন্য তার থেকে কম কিছু নয়। বোনের প্রেমের এই বেলেল্লাপনার কথাও সে দাদুকে বলেছে। দাদু সাত পাঁচ না ভেবেই বলে ফেলেছিল, তার বাড়িতেই বসন্তর সঙ্গে তার বোনের আলাপ। দূর্বার কাঁধ থেকে নেমে এখন তাহলে সে ভালো জায়গাতেই নোঙর ফেলেছে—এখানে বিয়ে দিতে ছেলের বাপ-মায়ের আপত্তি করার কথা নয়, ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে বিয়েটা দিয়ে দিলেই তো হয়। দাদু তাকে পরামর্শ দিয়েছে, বাবা মা-কে জিগ্যেস করে দেখো, ছেলেটা খারাপ নয়—তাদের আপত্তি না থাকলে আমিই ছেলের বাবা-মায়ের কাছে প্রস্তাবটা তুলতে পারি।

·· কোনো জবাব না দিয়ে কমলা সরকার নাকি থমথমে মুখে উঠে চলে গেছে।

সেদিন রাত আটটার পরে দূর্বা নিচে নেমে এসেছে। বাড়ি যাবে। দাঁড়িয়ে যেতে হলো। নিচের বসার ঘরের সামনে কমলা সরকার দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে ডাকল, শোনো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

দূর্বার বুক দুরু দুরু। আজ দুপুরে দু'দুবার ঘর থেকে বেরিয়ে রণিতের সঙ্গে ওকে কথা কইতে দেখেছে। বিজুর ঘরেও বিকেলে এসেছিল, তখনো সকলকে বেশিমাত্রায় হাসি-খুশি দেখেছে।

তার পিছনে নিচের বসার ঘরে ঢুকল। কোনরকম ভনিতা না করে কমলা সরকার গলা না চড়িয়ে কঠিন গলায় বলল, এ-সব কি শুরু হয়েছে?

জবাব না দিয়ে দূর্বা চুপচাপ চেয়ে রইল। আরো কঠিন গলা কমলা সরকারের।—কিছু বুঝছ না—কেমন? কিচ্ছু না?

নিজের অজ্ঞাতে মাথায় রক্ত চড়ছে দূর্বার। মাথা নাড়ল। কি-চ্ছু বুঝছে না।

—ওই একটা শয়তান ছেলেকে নিজের কাঁধ থেকে নামিয়ে এখন আমার বোনের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছ—কেমন ?

চোখে চোখ রেখে দূর্বা চুপ একটু। তারপর আস্তে আস্তে জবাব দিল, আপনার বোন কচি মেয়ে নয়, আমার থেকে বুদ্ধি বিবেচনাও তার কম নয়।

—ও···! গলায় শ্লেষের আগুন ঝরল এবার।—আর রণিত কাজকর্ম ছেড়ে এখানে পড়ে আছে কেন ? আপিসে পর্যন্ত যায় না কেন ?

দূর্বার সমস্ত মুখ লাল। দু'কান গরম।—এ কথা আপনি তাঁকে না বলে আমাকে জিগ্যেস করছেন কেন ?

—করছি কারণ আমার চোখে বেঁধে—বুঝলে ?

সংযমের বাঁধ ভাঙল দূর্বারও। যতকাল বিজু আছে ততোকাল অন্তত এই বড়দি চাইলেও তার এতটুকু ক্ষতি করতে পারবে না এ-বিশ্বাসে এখন আর কোনো ভুল নেই। গলা চড়ালো না। তেমনি চোখে চোখ রেখে বলল, আপনার অন্তত চোখে বেঁধা উচিত নয়···।

মুহূর্তের মধ্যে ওই থমথমে মুখ ফ্যাকাশে বিবর্ণ। হতচকিত। তারপরেই দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল কমলা সরকার।

দূর্বা পায়ে পায়ে বাড়ির বাইরে এলো। মিনিট খানেক হেঁটে এসে ট্রাম স্টপে দাঁড়াল।···সেই এক দুপুরে বাড়ির বড় ছেলের অনুপস্থিতিতে তিন তলায় উঠে তার ঘর থেকে চটি বই নিয়ে নেমে আসতে দেখাটা দূর্বার কোনদিন কাউকে বলার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বলল কিনা কমলা সরকারকেই।

ট্রাম থেকে নামল। বাড়ির পথ অন্ধকার। দু'দিকের বাড়ি-গুলোও। এখানে লোডশেডিং চলছে বোঝা গেল। ভিতরটা আরো তিক্তবিরক্ত হয়ে গেল দূর্বার।

দরজা দুটো ভেজানো। ঠেলতেই খুলে গেল। বাবার ঘর অন্ধকার। ওদের ঘরও। সামনের দিকে ভিতরের চিলতে বারান্দায় একটা হারিকেন টিমটিম করে জ্বলছে। দূর্বার রাগ হলো, একলা বাড়িতে দরজা খোলা রেখে শেফালি ঘুমুচ্ছে নিশ্চয়…

পরের মুহূর্তে কাঠ একেবারে। ওদের অন্ধকার ঘরে শেফালির অস্ফুট মিনতি।—না ছাড়ুন…আমার ভয়ানক ভয় করছে… ছাড়ুন…

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের প্রায় ফিসফিস গলা, অত ভয় কিসের, তোমার বাবা তো বেহুঁস হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে—এর পর একমাস ধরে সিনেমা দেখার টাকা দিয়ে যাব তোমাকে…লক্ষ্মী মেয়ে…ভালো করে আর একবার মাত্র…

কি যে হতে থাকল মাথার মধ্যে দূর্বা জানে না। বাইরের ভেজানো দরজাটা নিঃশব্দে আবার খুলে হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে বন্ধ করল, আর তারপরেই ছুটে গিয়ে বারান্দার হারিকেনটা হাতে করে সামনে এগিয়ে এলো। চোরের মতো তক্ষুণি ঘর থেকে বেরুলো বাবার মদের সঙ্গী অমল বিশ্বাস। একটু থমকেই দ্রুত দরজা খুলে রাস্তায়। শেফালি দিদির দিকে চেয়ে ভূত দেখছে।

হারিকেন হাতে দূর্বা ঘরে ঢুকল। মেঝেতে হারিকেনটা রাখল। ঘরের দরজা দুটো বন্ধ করল। শেফালি কাঁপছে।

দূর্বা ঝাঁপিয়েই পড়ল ওর ওপর। মারতে মারতে ওকে বিছানায় এনে ফেলল। শেফালি অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, দিদি তোর পায়ে পড়ি, আর কক্ষনো—

আর বলতে পারল না। দূর্বা ওর বুকে চেপে দু'হাতে গলা টিপে ধরল। একটা হাত তুলে নিজের শাড়ির আঁচলটা বুক-কাঁধ থেকে খসিয়ে যতটা পারে ওর মুখে গুঁজে গুঁজে দিল। তারপর পাগলের মতো কিল-চড়-ঘুষি। শেফালির দাঁত দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। দূর্বা পাগলের মতো মেরে চলেছে। চৌকির এক ধারেই

পালকের ঝাড়নটা পড়ে আছে। সেটা তুলে নিয়ে উল্টো করে বেতের দিকটা ধরে চৌকি থেকে নেমে আবার এলোপাথারি পিটতে লাগল। ওর শাড়ির আঁচল তখনো শেফালির মুখে গোঁজা।

পরদিন।

সকালে রাস্তার লোক কি নিয়ে জটলা করছে দূর্বা বুঝেছে। দিল্লীতে জনতা সরকারের আঠাশ মাস পাঁচ দিনের রাজত্ব শেষ হয়েছে। মোরারজি দেশাই রিজাইন করেছে। কিন্তু দূর্বার এ-নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। সে বাবার মুখোমুখি হবার অপেক্ষায় আছে।

কৃষ্ণেন্দু বোসের কাগজ পড়া আর দাড়ি কামানো শেষ। এবারে স্নানে যাবে। দূর্বা ঘরে ঢুকল। অনুচ্চ কঠিন গলায় বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে কৃষ্ণেন্দু বোস যথার্থ অবাক। একটু সচকিতও।

দূর্বার সমস্ত মুখ জ্বলছে, চোখেও আগুন ঠিকরোচ্ছে।—শোনো, তোমার অমল বিশ্বাসকে এই প্রথম আর শেষবারের মতো বলে দিও, আর একটা দিন যদি তাকে এ-বাড়িতে দেখা যায়, তার গায়ের ছাল চামড়া থাকবে না—এখান থেকে সোজা তাকে হাসপাতালে যেতে হবে—সেখান থেকে শ্মশানে। আমি দরকার হলে কতটা করতে পারি তোমার জানা আছে বোধহয়···

কৃষ্ণেন্দু বোস বিমূঢ়।—কেন? অমল কি করেছে? ইয়ে—অসভ্যতা করেছে কিছু?

—হ্যাঁ করেছে। কতটা করেছে তুমি ধারণা করতে পারবে না। ফের এলে কি হবে তুমি তাকে জানিয়ে দিও।

ঘর ছেড়ে চলে এলো।

ট্রামে বসে থেকে থেকে ঘড়ি দেখছে। সরকার বাড়ি পৌঁছতে আজ এক ঘণ্টারও বেশি দেরি হয়ে যাবে। একটা ছোট মিছিল পার হচ্ছে বলে ট্রামটা দাঁড়িয়ে আছে। এটা আনন্দ মিছিল।

দিল্লির জনতা সরকার পড়ে গেল দেখে যে-দল খুশি এটা তাদের মিছিল।

দূর্বা ভাবছিল, সুখ দুঃখ সব নিয়েই মানুষ হয়তো ইচ্ছে করলে সুখে না হোক কিছুটা শান্তিতে থাকতে পারে। নিজের মনে নিজের মতে চলতে পারে। কিন্তু থাকে না কেন? থাকতে পারে না কেন? কেউ যদি চায়ও থাকতে, অন্যে সেটা সহ্য করবে না। বাধা দেবে।··· এ-রকম হয় কেন!

বিজু বলল, আজ তোমার এত দেরি? আমি আর রণদা কত ভাবছিলাম—

—দেরি হয়ে গেল ভাই, তুমি রাগ করোনি তো?

বিজু হেসে উঠল, বোকা না হলে তোমার ওপর কেউ রাগ করতে পারে? রণদা বলছিল, শরীর-টরীর খারাপ হয়ে থাকতে পারে আমারও তাই ভাবনা হচ্ছিল—

অদূরের চেয়াবে রণিত চুপচাপ বসে আছে। এ-দিকেই চেয়ে আছে। বিমর্ষ, বিষণ্ণ। দিল্লীর ওলট-পালটের ফলে বোধহয়। দূর্বা হেসেই বিজুকে বলল, আমার শরীর-টরীর খারাপ হয় না।

গম্ভীর মুখে বিজু বলল, ও-রকম অহংকার করতে নেই, ঠাকুর রেগে গেলে দেবে'খন—

হাসতে চেষ্টা করে বণিত চেয়ার ছেড়ে উঠে ভিতরের বারান্দার রেলিংএ এসে দাঁড়াল। মিনিট পনের কুড়ি বাদে সুমতির খোঁজে দূর্বা বেরিয়ে এসে দেখে সে তখনো তেমনি দাঁড়িয়ে। দূর্বা তাড়াতাড়ি ও-দিকে চলে গেল। মনের তলায় কিছু দুর্ভাবনা থিতিয়ে আছেই। কমলা সরকারের আজ কোন্ মূর্তি দেখবে কে জানে। দোতলায় বসার ঘরের দরজার ও-ধারে দাঁড়িয়ে নির্মলা সরকার সুমতির সঙ্গে কথা কইছেন। ওকে দেখে বললেন, তোমার আজ আসতে কিছু দেরি হয়েছে, বিজু বার বার খোঁজ করছিল।

দূর্বা মনে মনে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কমলা সরকার মা-কেও কিছু বলেনি বোঝা গেল।—হ্যাঁ, একটু আটকে পড়েছিলাম। মাসি, বিজু একটু দুধ খেতে রাজি হয়েছে, তাড়াতাড়ি দিয়ে যাও—

সুমতি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। দূর্বাও ফেরার জন্য ঘুরেছে, নির্মলা সরকার অনেকটা নিজের মনেই বললেন, কমলাটা ক'টা দিন থাকবে বলে এসেছিল, আজ সকালেই হুট করে হস্টেলে চলে গেল। কি হলো, সুমতি কিছু জানে কিনা জিগ্যেস করছিলাম···কারোরই মতিগতি বুঝি না।

থাকবে বলে এসে বাড়ির মেয়ে হঠাৎ চলে গেলে মায়ের একটু দুশ্চিন্তা হবারই কথা। কিন্তু স্বার্থপরের মতোই দূর্বা ভারী হালকা বোধ করছে। ফিরে আসছে। রণিত ও-দিক ফিরে রেলিং-এ ভর করে দাঁড়িয়ে আছে।

দূর্বা বিজুর ঘরের কাছাকাছি এসে সিঁড়ির কাছে হুইস্কির গলায় আদরের আওয়াজ পেয়ে আবার ফিরল। বড়দা। নিচে থেকে ওপরে উঠে আসছে। দোতলায় পা দিয়ে হুইস্কির ঘাড় পিঠ চাপড়ে একটু আদর করল। একই সঙ্গে রণিতের দিকে চোখ গেল তার। মুখে টিপটিপ হাসি।—কি রে, দিল্লীর সিংহাসন তো ফাঁকা আবার, তোর বড় বড় সমাজসেবী নেতাদেরও ভোল পাল্টাতে দেখে মেজাজ খারাপ নাকি?

রণিতও সিঁড়ির দিকে ফিরেছে, শুনেছে। যে-রকম গম্ভীর, দূর্বার ভয় ধরল কিছু না বলে বসে। কিছুই না বলে শ্লেষটুকু হজম করল শুধু।

কিন্তু ও-দিক থেকে আর এক প্রস্থ ব্যঙ্গ ঝরল।—আমি তোকে আগেও বলেছি এখনো বলছি, যে-যার নিজের বুঝ বুঝে নেবার দিন এটা, সময় থাকতে এখনো বাবার সঙ্গে কাজে লেগে যা।

তিন তলায় উঠে গেল। রণিত দত্তর ঝাঁঝানো চাউনি দূর্বার মুখের ওপর ফিরল। কি-রকম ঘাবড়ে গিয়ে দূর্বা তক্ষুণি বিজুর ঘরে।

দুপুরে বিজুর চোখে তন্দ্রা নেমে আসতে দূর্বা পা টিপে ঘর ছেড়ে বেরুলো। ওই লোক এখন বারান্দার ইজিচেয়ারে শুয়ে, জানে। বিজুর ঘুম ভাঙলেই তলব পড়ে তাই বারান্দাতেই থাকে বেশির ভাগ সময়। কাগজ পড়ে। বই পড়ে। আর দূর্বার ধারণা এ-সময় ওর সঙ্গে একটু গল্প-টল্প করার বাসনাও রণিত দত্তর মনের তলায় থাকে। প্রায়ই উঠে একটা গদির মোড়া এনে সামনে পেতে দেয়, বলে বসুন, আপনি পারেনও—বিজু সাধে কেনা হয়ে আছে আপনার কাছে!

আজ বসেই আছে। কিছু পড়ছে না। চুপচাপ চেয়ে রইল।

দূর্বা কাছে এসে হেসেই বলল, সত্যি মন খুব খারাপ আজ—না?

মুখে হাসি টেনে এনে রণিতও নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল, মন খারাপ হবে কেন, মুখোস খুলে গেল, সকলের স্বরূপ দেখা গেল—ভালই হলো। বড়দা ঠিকই বলেছে।

—তাহলে সকাল থেকে আপনি এমন গুম হয়ে আছেন কেন?

—তা না, আমাদের অবস্থাখানা ভাবছিলাম। সোজা হয়ে বসল একটু।—যেমন ধরুন আমি স্বাধীনতার পাঁচ বছর পরে জন্মেছি, আপনি হয়তো দশ বছর পরে। আমরা দু'শ বছরের দাসত্বের শিকল ভাঙার কথা বইয়ে পড়ছি আর নেতাদের মুখে হাজার বার করে শুনছি। কিন্তু বড় হতে হতে আমরা দেখছি কি? আমাদের আষ্টে-পৃষ্টে কেবল দাসত্বের শেকল—ক্ষুধার শেকল, অভাব-অনটনের শেকল, অশিক্ষার শেকল, কুসংস্কারের শেকল—ভাবুন একবার, নেতারা বোঝায় তবু নাকি আমরা স্বাধীন! বড়দা ঠিক কথা বলেছে, খুব খাঁটি কথা বলেছে।

দূর্বা রাজনীতির বিন্দু-বিসর্গ বোঝে না। তবু ভালো লাগছে। সান্ত্বনার সুরে বলল, কিন্তু এ-রকম তো আর বরাবর চলতে পারে না—

থেমে গেল। লোকটা আরো সোজা হয়ে বসল। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এঁটে বসতে লাগল। স্নায়ুগুলো সব টান-টান। চোখে

সাদাটে আগুনের হলকা। বলে উঠল, না চলতে পারে না—যেদিন সব লোভ আর সব স্বার্থ নিয়ে সক্কলে আমরা পচে গলে মাটিতে মিশে যাব—আর সেই উর্বর মাটিতে অন্য মানুষ গজাবে—তখন সব অন্য-রকম হবে। কিন্তু তার এখনো ঢের ঢের ঢের দেরি—বুঝলেন? ততোদিন?

দূর্বা বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

আত্মস্থ হয়ে রণিত দত্ত হঠাৎই হেসে ফেলে ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিল আবার। বলল, কেমন লেকচারখানা দিলুম দেখুন—নেতাদের বক্তৃতা শুনে শুনে আর কাগজে বড় বড় কথা লিখে আমারও বারোটা বেজে গেছে।

দূর্বা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

দিন দশেকের মধ্যে ভূমিকম্প।

বিজুর শরীর ক'দিন ধ'রেই ভালো যাচ্ছিল না। ক্লান্তি বাড়ছে, অবসাদ বাড়ছে। ঝিমোয় বেশি। দূর্বা বুঝতে পারছে আবারও রক্ত দেবার সময় এগিয়ে আসছে। রণিতকে বলেছেও সে-কথা। কিন্তু আচমকা বিপদ এমন ভয়াবহ আকারে দেখা দিতে পারে ভাবেনি।

দুপুরে সেদিন রণিত পর্যন্ত বাড়ি নেই। কাগজের আপিস থেকে তার পাওনা টাকা-কড়ি আনতে গেছে। বিজু বিছানায় শুয়ে ছিল। দূর্বা তাকে ছোটদের বেশ মজার একটা বাংলা গল্পের বই পড়ে শোনাচ্ছিল।

খানিকক্ষণের মধ্যে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে দূর্বা তার দিকে তাকালো। প্রথমে মনে হলো অন্য দিনের মতো গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তার পরেই মনে হলো মুখটা কি-রকম দেখাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। ঠোঁটের কোণে রক্তের আভাস। মুখের ওপর ঝুঁকে তাড়াতাড়ি ঠোঁট ফাঁক করে দেখে

ভেতরটা রক্তে ভেজা। তারপরেই দেখে হাতের কাছে ঘন কালো দাগড়া দাগড়া কি-সব।

—মাসিমা! সুমতি মাসি!

আর্তনাদ করেই দূর্বা দরজার দিকে ছুটল। বারান্দা থেকে ঘেউ ঘেউ করে আগে হুইস্কি ছুটে এলো। কোনদিকে না তাকিয়ে দূর্বা পাগলের মতো তিন তলায় উঠে এলো। শেষের ঘরের দরজায় এসেই থমকে দাঁড়াল। ঘরের লোক ইজিচেয়ারে শুয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন। কোলের ওপর চটি বই একটা। কিন্তু এই মুহূর্তে দূর্বার অন্য কোনো দিকে হুঁশ নেই।—বড়দা, শিগ্‌গীর নেমে আসুন—বড়দা!

বড়দা চেয়ার থেকে ছিটকে উঠে দাঁড়াল।

—বিজুকে খুব খারাপ দেখছি, মুখে রক্ত, গায়ে কালো কালো দাগ, জ্ঞান নেই—

তার মুখের দিকে চেয়ে মানুষটা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তারপরেই ঝড়ের মতো বেরিয়ে এলো। পিছনে দূর্বা।

বিজুর বিছানার পাশে এসে বড়দা আবার স্থির হয়ে দাঁড়াল। সকলের উদ্‌গ্রীব চোখ বড়দার দিকে। নির্মলা সরকারের, সুমতির, দূর্বার, এমনকি হুইস্কিরও।

দেখেই বড়দা যা বোঝার বুঝল।

গাড়ি ছুটেছে। বড়দা ড্রাইভ করছে। তার পাশে নির্মলা সরকার। তার পাশে সুমতি। পিছনে দূর্বা দরজায় পিঠ দিয়ে বসে, তার কোলে অচেতন বিজু।

দূর্বার বুকের ভেতরটা এত কাঁপছে, মনে হচ্ছে বিজুরও তাতে অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু ও কাঁপুনি থামাবে কি করে?…বিজুকে নিয়ে আসার সময় হুইস্কিটাও কি-রকম ডাকছিল। ও-রকম করে কক্ষনো ডাকে না।

হাসপাতাল।

তিন ঘণ্টা হয়ে গেল, বিজু রক্ত নিতে পারছে কি পারছে না দূর্বা কিছুই বুঝতে পারছে না। একভাবেই বেহুঁসের মতো পড়ে আছে। অবশ্য রক্ত দেবার সময় এমনিতেই পেশেণ্টকে সিডেশনে রাখা হয়। তবু অবস্থা আদৌ ভালো নয়, এক-একবার দরজায় উঁকি দিয়ে এটুকু বুঝছে। বিশাখা ব্যানার্জীর চেষ্টায় একে একে তিনজন বড় ডাক্তার এসে গেছে। তারা চলে যাচ্ছে আবার খানিক বাদে বাদেই ফিরে আসছে। বিশাখা ব্যানার্জীও সেই থেকে ছোটাছুটি করছে। বাড়ির লোকের মধ্যে কেবিনে শুধু বড়দা আর রণিত দত্ত আছে। বাইরের বেঞ্চিতে বিজুর বাবা মা বড়দি ছোড়দি। অদূরে বসন্ত রায়। কেউ একটা কথা বলছে না। নড়ে চড়েও বসছে না। বড়দা বেরিয়ে গিয়ে প্রায় আধঘণ্টা বাদে কাকে সঙ্গে করে ফিরল।

দূর্বার ধারণা ঘরের মধ্যে যমে মানুষে টানাটানি চলেছে। বিজুর ছোট্ট শরীরটা ঘুরিয়ে শিরদাঁড়া ফুঁড়ে ভয়ংকর একটা ইনজেকশান দেওয়ার তোড়জোড় চলেছে দেখে দূর্বা কান্না চেপে দরজার কাছ থেকে সরে গেল।

প্রায় সন্ধ্যের কাছাকাছি এ যাত্রায় মানুষেরই জয় হলো কি? দূর্বা ঠিক বুঝতে পারছে না। বিশ্বাস করতে সাহসে কুলোচ্ছে না। দু'জন বড় ডাক্তার বেরিয়ে গেল। একজন থাকল। বিজুর হাতের শিরায় ইনজেকশন বেঁধা, সামনের ফ্রেমে উপুড় করা রক্তের বোতল। আর কারো মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। দূর্বা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রণিতকে লক্ষ্য করছে। তার মুখে স্বস্তির আভাস।

এরপর আস্তে আস্তে বোঝা যেতে লাগল অবস্থা ভালোর দিকে।

রাত প্রায় ন'টার সময় বড়দা ঘর ছেড়ে বাইরে এলো। বাবা-মাকে বলল, ভালো আছে। তোমরা আর রাত করো না, বাড়ি চলে যাও।

দূর্বার বুক থেকে পাথর নেমে গেল। বড়দার কথা সকলের কাছেই হুকুমের মতো। ঘুমন্ত বিজুকে একবার দেখে সকলে একসঙ্গেই চলে গেল। তখনো কারো মুখে কথা নেই।

রাত সাড়ে দশটা।

বড়দা বাইরের বারান্দায় পায়চারি করছে। রণিত দত্ত একের পর এক সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। দূর্বা এক-একবার কেবিনে ঢুকে ঘুমন্ত বিজুকে দেখে আসছে। তার মুখের চেহারা ক্রমশ যত ভালো লাগছে ততো বেশি দেখার লোভ। ঘরে এখন একজন নার্স, একজন জুনিয়র ডাক্তার আর বিশাখা ব্যানার্জী। সমস্ত রাত পেশেণ্টের রি-অ্যাকশন লক্ষ্য করার জন্য ওই ডাক্তারকে রাখার ব্যবস্থা বিশাখা ব্যানার্জীই করেছে।

শ্রান্ত বিশাখা ব্যানার্জীও এবারে বাইরে এলো। রণিত আর দূর্বাকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা মুখ হাত ধুয়ে নাও, খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, বেঞ্চিতে বসেই খেয়ে নিও। বড়দার দিকে ফিরল, তুমি কি করবে?

জবাব না দিয়ে বড়দা চুপচাপ তার দিকে চেয়ে রইল।

—থেকে যেতে চাও তো এসো, আমার ঘর ছেড়ে দিচ্ছি।

বড়দা সোজাসুজি তেমনি চেয়ে আছে।—আমার এখন ড্রিংক দরকার, আছে কিছু?

—এখানে থাকবে কি করে!…বাড়িতে ফোন করে আনিয়ে দিতে পারি।

—থাক্। তুমি যাও, আমি চলে যাব।

বিশাখা ব্যানার্জী তবু অপেক্ষা করল একটু। তারপর পায়ে পায়ে চলে গেল।

বড়দা বারান্দায় আবার পায়চারি করল একটু। তারপর ওদের দু'জনের সামনে এসে থামল। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আঁচড়।—বিজু এবারকার মতো ফিরল তাহলে…।

দূর্বার কানে 'এবারকার মতো' কথা দুটো খট্ করে বিঁধল। একটুও ভালো লাগল না। রণিত দত্ত নির্বাক।

—ভালো কথা, বড়দার ঠোঁটের হাসি আরো স্পষ্ট, বিজুর ইনজেকশান কিনতে বেরিয়ে শুনলাম, সঞ্জীব রেড্ডী মিনিস্ট্রি ফর্ম করার জন্য চরণ সিংকে ডেকেছে—শুনেছিস?

সিগারেট হাতে রণিত দত্ত একটু থমকে দাঁড়ালো। হাঁ না কিছুই বলল না।

বড়দা আবার পায়চারি করছে আস্তে আস্তে। অল্প অল্প হাসছেও। মন্তব্য করল, ছাখ্ ক'দিন চলে···

শোনামাত্র দূর্বার মনের তলায় কি-রকম মোচড় পড়ল একটা। বড়দা মুখে যা বলল সেটুকুই সব মনে হলো না তার।···বড়দার চোখে বিজু নাকি ইণ্ডিয়ার মতো। বিজুরও আজ রক্ত বদল হলো। দুই-ই আপাত-ফাঁড়া কাটার মতো এক-রকম ভাবছে বড়দা?

বড়দা আবার এসে ওদের দু'জনের সামনে দাঁড়াল। শুধু ঠোঁটে নয়, চোখেও কৌতুক চিকচিক করছে। রণিত দত্তকে জিজ্ঞাসা করল, পৃথিবীতে সব থেকে ইণ্টারেস্টিং জিনিসটা কি বল্ তো?

রণিত তার দিকে চেয়ে সিগারেট টানছে। নিরুত্তর।

বড়দা দূর্বার দিকে ফিরল, তুমি বলতে পারো?

নির্বাক সে-ও।

—তুমিও পারলে না? হোয়াই—ইটস্ ম্যান! মানুষ! মানুষ ইজ্ দি মোস্ট্ ইণ্টারেস্টিং ফুল ইন দিস ওয়ার্ল্ড। মানুষ নামে এক জীব মাথার ওপরে ঈশ্বর নামে একজনের সব থেকে সেরা সৃষ্টি ভাবে নিজেকে। হিজ্ নোব্‌লেস্ট ওয়ার্ক। বড়দা আরো হাসছে।—কি-রকম ফানি বোঝো—মুখ্যু জ্ঞানের কথা বলে, নির্বোধ বুদ্ধির বড়াই করে, ভণ্ড সততার হাঁক পাড়ে—এই মানুষ কিনা সৃষ্টির গর্ব! ঈশ্বরের ন্যায়ের শক্তি তার মধ্যে কাজ করছে?

দূর্বা বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে। বড়দা আস্তে আস্তে বিজুর

কেবিনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। গলা নামিয়ে বলল, আসলে যে শক্তি কাজ করছে তা রোগ···শোক···ধ্বংস—ডিজিজ্, ডেথ্ অ্যাণ্ড্ ডিজ্যাস্টার!

বড়দা চলে যাচ্ছে। দূর্বা বোসের ভীতত্রস্ত বড় বড় দুই চোখ তাকে অনুসরণ করল। তারপর রণিত দত্তর দিকে ঘুরল। একটা অব্যক্ত আর্তনাদ ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে। এ হতে পারে না—মানুষ সম্পর্কে এ-ই শেষ কথা হতে পারে না! বিজুরা একদিন বাঁচবেই—ইণ্ডিয়া বাঁচবেই! একটু আশ্বাসের আশায় দূর্বা বোসের দু'চোখের আর্তনাদ রণিত দত্তর মুখের ওপর আছড়ে পড়ল।

রণিত দত্ত সিগারেট টেনে চলেছে।